তাবলীগ জামা'আত একটাই, এতায়াতিরা নতুন ফেরকা, ওদের তওবা করা উচিত

শাইখুল হাদীস আল্লামা মাহমূদুল হাসান সাহেব দা.বা.

গত ২২ নভেম্বর ২০১৮ ঈসাব্দে ঢাকার জামি'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া যাত্রাবাড়ীতে সাপ্তাহিক তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে দাওয়াত ও তাবলীগের চলমান সংকট বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন যাত্রাবাড়ী মাদরাসার মুহতামিম, মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশের আমীর ও গুলশান আজাদ মসজিদের মুহতারাম খতীব আল্লামা মাহমূদুল হাসান দা.বা.

হামদ ও সালাতের পর...

শুনছি ইজতেমা নাকি দুই ভাগ হয়ে যাচ্ছে! কাকরাইল ভাগ করার কথা উঠছে! অথচ প্রধান উপদেষ্টা হওয়া সত্ত্বেও আমি কিছুই জানি না! সবাইকে জানিয়ে রাখি, তাবলীগ একটিই আছে; আগে যেমনটি ছিল। হ্যাঁ, নতুন একটি দল হয়েছে, যারা নিজেদেরকে 'এতায়াতি' বা সাদপন্থী বলে পরিচয় দিচ্ছে। এরা নতুন দল গঠন করে তাবলীগ থেকে বের হয়ে গেছে। তাবলীগের সাথে এদের কোনই সম্পর্ক নেই।

এ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম চেষ্টা করছেন যে, দ্বন্দ্ব নিরসন করে সবাইকে মিলানো যায় কিনা। এতবড় বিপদ এখনো পর্যন্ত মুসলমানের ওপর আসেনি। নবীজীর যুগে এসেছিল, এর পরে ইসলামের উপর এতবড় বিপদ আর আসেনি। আমার কাছে এমনটিই মনে হয়। এটি এক ভয়ংকর বিপদ, যেখানে এক মুসলমান অপর মুসলমানকে কাফের বলে গালি দিচ্ছে। জন্তু-জানোয়ারের মত পেটাচ্ছে। নিজের ভাইকে হত্যা করে কাফের হত্যার সওয়াব লাভ করতে চাচ্ছে। সাধারণত ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু, কাদিয়ানীরাও কোন মুসলমানকে এভাবে গালি দেয় না, নির্যাতন করে না।

কিছু অবুঝ (এতায়াতি) আজ এসব গর্হিত কাজ করে যাচ্ছে। আলেমদেরকে বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করা হচ্ছে। আগে থেকে গুণ্ডামী করতো এমন লোকও তাদের মধ্যে আছে। তারাই এই জঘন্য অপকর্মগুলো চালিয়ে যাচ্ছে। আলেমদের দ্বারা এগুলো কখনও সম্ভব নয়। আলেমরা বুঝাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা বুঝতে নারায।

আমরা যে বুঝাবার চেষ্টা করছি সেটাকে তারা মনে করে দুর্বলতা! তার মানে তারা চায়, আমরাও তাদের মত লাঠি নিয়ে নেমে পড়ি!

সেদিন একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, ইজতেমা কয়টা হবে? আমি বললাম, কয়টা মানে? তাবলীগের ইজতেমা তো একটাই হয়। আজকাল সমাজের মধ্যে এটা খুব চলছে।

কয়েকদিন আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে আমাকে এবং একজনকে (মাওলানা যুবায়ের সাহেব) ডেকেছে। সবাই মনে করেছে, আজকে আলেমরা মার খেয়ে আসবে। যারা আলেম-বিরোধী তারা মনে করেছে আজকেই সুযোগ!

আমি গিয়েছি, বসে আছি। জিজ্ঞেস করলাম, দুটি ইজতেমা কেন হবে? তারা বলল, তাবলীগ না ভাগ হয়ে গেছে! বললাম, কে বলল? আমি-না উপদেষ্টা? আমিই তো জানলাম না! ভাগ হলো কোথায়?

এখন একটা সংকট চলছে। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করছে। এই সংকট মেটাতে হবে। আমরা মেটানোর চেষ্টা করছি। গত ইজতেমা তো সুন্দরভাবে হয়ে গেছে। সামনেও যাতে ভালোভাবে হয়, আমরা সচেষ্ট থাকবো। তখন একজন বলল, ভাগ তো হয়েছে কারণ, 'এতায়াতি পার্টি' নামে একটি দল বের হয়েছে। আমি বললাম, এটা তো এতায়াতি পার্টি, তাবলীগের পার্টি না। বাপ মারা গেলে একাধিক ভাই থাকলে জমির ভাগ হয়। কিন্তু আমরা তো ভাগ হচ্ছি না। আমরা তাবলীগওয়ালা এক আছি। ওরা (এতায়াতিরা) বের হয়ে নতুন দল বানিয়েছে। ওরা ইজতেমার জন্য একটি মাঠ বানিয়ে নিক। ওরা কাকরাইল কেন যাবে? ওরা এতায়াত নামে পৃথক একটি মারকায বানিয়ে নিক। যেগুলো তাবলীগ থেকে বের হয়ে গেছে এগুলো এতায়াত পার্টি, এরা তাবলীগের কেউ না। এতায়াতিরা আলাদা মারকায কিনে নিক, আরেকটা মাঠ বানাক। এটা তো (কাকরাইল মারকায, টঙ্গী ময়দান) তাবলীগওয়ালাদের।

এটাতে তুমি ভাগ বসাতে চাও কেন? তুমি তো বেশির চেয়ে বেশি পালকপুত্র হতে পারো! পালকপুত্র কি ওয়ারিস হয়? ওয়ারিস হতে হলে আপন ভাই হতে হয়। তোমরা তো কোনভাবেই ওয়ারিস হবার যোগ্যতা রাখো না।

এই কথাগুলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে বলার পর আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রশ্ন করলাম, তার (মাওলানা সাদ সাহেবের) কি তারিখ দেয়ার অধিকার আছে? তাকে তো গত ইজতেমায় ঢুকতেই দেয়া হয়নি! তিনি তারিখ দিবেন কোন অধিকারে? তো তার দেয়া তারিখ দিয়ে আরেকটা জোড় করার কথা বলছেন? বলুন! তার কি অধিকার আছে তারিখ দেয়ার? তারা বলল, না। বললাম, তাহলে? যান, পরামর্শ শেষ।

এখন অনেকে বলছে, আরে হুযুর (আল্লামা মাহমূদুল হাসান) যে প্যাঁচ ধরলো তা তো খেয়ালেই আসেনি!! কথা সত্য কিনা?

ওরা বের হয়ে গেছে তাবলীগ থেকে। বিভিন্ন নামে ইসলামের খেদমত হচ্ছে (মুয়াজ্জিন কমিটি, ইমাম পরিষদ ইত্যাদি।) তো তারাও এমন একটি বের করেছে। হ্যাঁ, ওরা যদি তাবলীগে ফিরে আসে তবে কোনো বাধা নেই। ওরা সারা বাংলাদেশ থেকে রুজু করে, তওবা করে ফিরে আসুক। তারা এলান করে বলুক যে, আজ থেকে আমরা আর এতায়াত পার্টি না, আমরা তাবলীগে ফিরে এসেছি।

চট্টগ্রাম থেকে এক এতায়াতি মুরুব্বী ফোন দিয়েছেন। জিজ্ঞেস করলেন, হুযুর আপনি নাকি এমন বলেছিলেন? আমি বললাম, ভুল বলে থাকলে বলেন? বললেন, না, ঠিকই বলেছেন। তো, কী করবেন? নাহ, আজ থেকে আমি নিজেকে আর এতায়াত পার্টি বলব না। আমি রুজু করলাম। আমি বললাম, এই তো আপনি ভালো বুঝেছেন। এখন সবাইকে বলে দেন, সবাই যেন রুজু

করে নেয়। সবাই রুজু হয়ে, সবাই মিলে রুজুনামা চট্টগ্রামের পটিয়া মাদরাসায় পাঠিয়ে দেন। আমরা সবাই মিলে একসাথে একটি ইজতেমা করব। দুটি করব না। দুটি হলে ঝগড়া হবে। ঝগড়া, মারামারি এটা তাবলীগ নাকি?

তাবলীগ তো মার খায়, মার দেয় না। যারা মারামারি করে তারা কখনো তাবলীগের কেউ হতে পারে না। তাদের তাবলীগে চোর, মুনাফেক ঢুকে গেছে। দলাদলি সৃষ্টি করে। তাবলীগে তো মারামারি নাই, গালাগালি নাই।

এক জায়গায় প্রশ্ন করল, হুযূর! আমরা কী করব? বললাম, যে গালাগালি করে তাকে বাদ দিন। আলেম কখনো গালাগালি করে না, যদি আলেম হয়েও গালাগালি করে তবে সে-ও বাদ!

আমি ১২ বছর আগে যে সংশোধনী দিয়েছিলাম তা মেনে নিলে আজকে এ অবস্থা হতো না। এখন বলে, "আরে হুযূর তো ঠিকই বলছিল!!"

ওই যে আমরা মনে করছিলাম, আলেমের প্রয়োজন নাই। এরা ভালো কাজ করতেছে, যথেষ্ট। খেয়াল করি নাই আমরা। এখন বিশ্বাস করছি। এত সুন্দর আখলাক-চরিত্র! স্কুল-কলেজ থেকে বেশ্যাপাড়া থেকে লোক ধরে ধরে এনে কালিমা পড়িয়ে টুপি, জামা পরিয়ে বুযুর্গ বানিয়ে দিয়েছে। এটা যে প্রশংসনীয় কাজ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আলেমদের ভুলটা এখানেই হয়েছে যে, আলেমরা সরল মনে বিশ্বাস করে সবকিছু তাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছে!

এখন ওরা চেয়ার পেয়ে বসে গেছে, এখন আর আলেম দরকার নাই!! এই কথাগুলো আমি ১২ বছর আগে একটি বইয়ে লিখেছিলাম যে, 'আমীর আলেম হতে হবে, গাইরে আলেম আমীর হতে পারবে না।' যদি ১২ বছর আগে এটা মানা হতো তাহলে আজ এমন ফেতনা হতো না।

এখন চলতি জামা'আতগুলোর আমীর হয় একজন ইংরেজী পড়ুয়া!! ইংরেজী পড়ুয়া কী বুঝবে দীনের? এই যে আয়াত পড়ছি, বলেন তো কিছু বুঝতেছেন? আলেম ছাড়া দীনের কাজ চলে কিভাবে? আমরা এটা বুঝি নাই, আমাদের ভুল হয়েছে। আগে থেকেই এটা করা উচিত ছিল। এখন ফল কী হলো?

হে উলামায়ে কেরাম! আপনারা ভেবেছিলেন, আমরা মাদরাসা, মসজিদ আর ইমামতি নিয়ে থাকি, আর তারা (জনসাধারণ) তাবলীগের কাজ করুক। আপনারা তাদেরকে বিশ্বাস করেছিলেন যে, তাদের মাধ্যমে বিরাট কাজ হচ্ছে বা হবে। কিন্তু এখন দেখুন, সময়মত সব প্রকাশ পেয়ে গেছে। আপনারা যেটাকে ভালো মনে করছিলেন, সেটা আপনাদের জন্য একট কঠিন পরিস্থিতি ডেকে এনেছে।

এই তাবলীগের ভেতর আমাদের উলামাদের আগে থেকেই শক্তিশালী অবস্থান না থাকার কারণে আজ কী পরিমাণ দুরবস্থার সম্মুখীন হচ্ছি আমরা। কাদিয়ানীরা এত শক্তিশালী হয়েও কখনো আমাদের গালি দিতে পারেনি অথচ আজ তারা (এতায়াতিরা) সেই গালি দিচ্ছে। বলছে, আলেম দরকার নাই তাবলীগে!

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, "আলেম ছাড়া আমি কাউকে দীনের কাজের দায়িত্ব দিয়ে যাইনি। তোমরা আলেমদের দেখে শুনে রাখবে, আলেমদের সাথে মিলেমিশে কাজ করবে। আলেমরা যেটা বলে সেটা মেনে নির্দ্বিধায় মেনে চলবে।" এই আলেম সমাজকেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া' আখ্যায়িত করেছেন।

এতায়াতিরা বলে, তারা নাকি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ করবে। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা অমান্য করে বা বাদ দিয়ে অথবা ভুল ব্যাখ্যা করে তারা রাসূলের কোন কাজটা করবে, আমার বুঝে আসে না!!

তাদের তো উচিত ছিল এই কথা বলা যে, 'আমাদের ভুল হয়ে গেছে, আমরা মাফ চাই।' কিন্তু মাফ চাইবে তো দূরের কথা, কিছু বলতে গেলেই এখন লাঠি নিয়ে আসে!!

আল্লাহ তাদেরকে সঠিক বুঝ ও হেদায়াত দান করুন।

অনুলেখক, জুবায়েদ ইসলাম ফয়সাল
সম্পাদনা, সাঈদ আল হাসান

========================

(২৪ পৃষ্ঠার পর; সাঈদ খান সাহেবের বয়ান)

ইমামদের জন্য পাঁচটি কাজ খুবই জরুরী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায কেমন ছিল আগে তা ভালোভাবে জানা। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

অর্থ: তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছো, সেভাবে নামায আদায় কর। (সুনানে বাইহাকী; হা.নং ৩৮৫৬)

এটা জানার পর–

১. মুসল্লীদের নামায দুরস্ত করি।

২. মহল্লার যেসব লোক জামা'আতে উপস্থিত হল না, কেন হল না খোঁজ নিতে তাদের ঘরে যাই। এটাও সুন্নাত।

৩. মুসল্লীদের কেউ অসুস্থ হলে তার খোঁজ-খবর নেই, তাকে দেখতে যাই।

৪. কেউ ইন্তেকাল করলে জানাযায় শরীক হই।

৫. মাস্তুরাতরা নামাযের পাবন্দী করছে কিনা মাহরামদের মাধ্যমে খোঁজ নেই।

মুসলমানদের ঘরে ঘরে পাঁচটি আমল থাকা চাই

১. সাত বছর বয়স থেকে বাচ্চারা নামাযী হয়।

২. সবাই কুরআন শেখে/শেখায়।

৩. যিকির-তাসবীহাত ও মাসনূন দু'আর পাবন্দী করে।

৪. ইলমের হালকা হয়।

৫. পুরুষ-মহিলা প্রত্যেকে দাওয়াত দেয়।

এ পাঁচটি হল মুসলমানদের প্রতিটি ঘরের আমল। বলুন! সব ঘরে কি এ পাঁচ আমল আছে? নাই। তবু আমরা উদাসীন হয়ে থাকছি, ঘুমাচ্ছি...। সামান্য ভেবেও দেখি না যে, আমার ঘরে রহমতের ফেরেশতা আসছে, নাকি শয়তান আসছে? ঘরে বে-নামাযী থাকলে রহমতের ফেরেশতা আসা বন্ধ হয়ে যায়। ঘরে কুকুরের বাচ্চা থাকলেও রহমতের ফেরেশতা আসে না।

দাওয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে উঁচা করে দিবেন। তিনি ব্যবসায়ী, কৃষিজীবী এমনকি বাদশাহর গর্দানও আপনাদের সামনে ঝুঁকিয়ে দিবেন। এজন্য মেহেরবানী করে আযম করে নেন যে, দাওয়াতের যরিয়ায় পুরা উম্মতকে নিয়ে চলব। এই যে সাধারণ মানুষের শত-শত জামা'আত বের হচ্ছে এসব জামা'আতকে ঈমানিয়াত, ইবাদাত, মু'আমালাত, মু'আশারাত ও আখলাক তো আপনাদেরকেই শেখাতে হবে।

আলহামদুল্লিাহ! এই ইলমের বরকতে আপনাদের দেশে যে পরিমাণ দীন আছে, তা আমি কোথাও দেখিনি; না হিন্দুস্তানে, না পাকিস্তানে...।

[বি. দ্র. আয়াত ও হাদীসসমূহের ইবারত ও হাওয়ালা অক্ষর-বিন্যাসকারী কর্তৃক সংযোজিত ও অনূদিত। অক্ষরবিন্যাস-কারী জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় হিফয, দাওরা ও ইফতা সমাপনকারী, বয়ান লেখকের মেঝোপুত্র মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন ক্বাসিম।]

বিসমিহী তা'আলা

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় শিক্ষাসমাপনকারীদের সমন্বয়ে গঠিত

'রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া'র

ফুযালা সম্মেলন ২০১৯

স্থান

জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া

১৬ মার্চ ২০১৯ শনিবার

সকাল ৯টা হতে আসর পর্যন্ত

সম্মেলনে
রাবেতার সকল সদস্যকে
স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের
আহ্বান জানানো যাচ্ছে

কেন্দ্রের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও রাবেতার কোনও কোনও সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব না-ও হতে পারে, এজন্য ফুযালায়ে কেরামকে পার্শ্ববর্তী/পরিচিত সদস্যদের সঙ্গে যথাসাধ্য যোগাযোগের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

দূরবর্তী ফুযালায়ে কেরামকে সম্মেলনের আগের দিন চলে আসার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

জামি'আর পক্ষে

মুফতী মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

মাওলানা হিফজুর রহমান
মুহতামিম
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

রাবেতার পক্ষে

মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম আল মাসউদ
আমীরে মজলিসে শূরা
রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া

দাওয়াত ও তাবলীগের প্রাণপুরুষ হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার আলোকে টঙ্গীর ময়দানে সংঘটিত মর্মান্তিক ঘটনার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ–

কিছু ভুল, কিছু নিবেদন

শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

সম্প্রতি টঙ্গীর ময়দানে দুঃখজনক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে। সেখানে উলামায়ে কেরাম, মাদরাসার ছাত্র ও হকপন্থী তাবলীগী সাথীরা নির্দয় হামলা ও নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন...! অথচ দাওয়াত ও তাবলীগের প্রাণপুরুষ হযরতজী ইলিয়াস রহ. দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন,

اپنی اس تحریک کے ذریعہ ہر جگہ کے علماء اور اہل دین اور دنیاداروں میں میل ملاپ اور صلح وآشتی کرانا چاہتے ہیں-

“আমি এই ‘তাহরীকের’ মাধ্যমে প্রত্যেক জায়গায় উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীন এবং দুনিয়াদারদের মাঝে মেলামেশা, সৌহার্দ্য-ভালোবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে চাই।” (মালফুযাতে মাওলানা ইলিয়াস; ১০২ নং মালফুয)

কাজেই সময়ের দাবী হিসেবে হযরতজী ইলিয়াস রহ.-এর চিন্তাধারা ও কর্মপন্থার আলোকে দাওয়াত ও তাবলীগের বর্তমান অবস্থা এবং এ ঘটনার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা আবশ্যক বলে মনে হয়।

টঙ্গীর এ মর্মান্তিক ঘটনার বিশ্লেষণ করতে গেলে বেশ কয়েকটি ভুল চিন্তাধারা এবং কর্মপন্থাকে এর নেপথ্যের কারণ বলে মনে হয়। আমরা আমাদের দীনী ভাইদের কাছে আন্তরিকভাবে আশা করব, যেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হয়।

প্রথম কারণ : দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানকে ‘অনাধিকারচর্চা’ মনে করা এবং তাদেরকে দাওয়াতের এ কাজের পৃষ্ঠপোষকতার যোগ্য মনে না করা।

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত একটি দীনী কাজ। কোনো দলীয় কাজ নয়। দীনী কাজের নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা এবং আল্লাহর রাসূলের পক্ষ হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত। হাদীসে পাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم

‘আলেমগণ নবীগণের উত্তরসূরী। আর নবীগণ দীনার-দিরহাম (অর্থ-সম্পদ)-এর উত্তরাধিকারী রেখে যান না; বরং তারা তো ‘ইলম’ (ইলমে ওহী)-এর উত্তরাধিকারী রেখে যান।’ (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৬৪১)

ইলমে ওহী তথা কুরআন-হাদীসের ইলম ছাড়া দীনী যে কোনো বিষয় ‘জাহালত’ তথা মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতার কারণ। কাজেই তাবলীগের কাজ–যেখানে কুরআন-হাদীসের ইলমেরই দাওয়াত দেয়া হয়–সেখানে উলামায়ে কেরামের হস্তক্ষেপ ‘অনাধিকারচর্চা’ নয়; বরং ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালন’ বলেই মনে করতে হবে।

ইতিহাস পাঠের দ্বারাও এ বিষয়টি জানা যায় যে, হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর আন্তরিক ইচ্ছা ছিলো, এ কাজের তত্ত্বাবধান স্বয়ং উলামায়ে কেরাম করবেন।

হযরত মাওলানা মনযূর নূমানী রহ. বলেন, ‘আমাকে একবার (হযরত ইলিয়াস রহ.) বলেন, “*মৌলবী সাহেব! আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে যে, এ কাজ হবে এবং আল্লাহর মদদ একে পূর্ণতা দান করবে। তবে শর্ত হল, সাহায্যের ওয়াদার উপর পূর্ণ বিশ্বাস এবং সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টায় কোন ত্রুটি না করা।*” এ কথার পর হযরতের চোখ বুজে এল। কিছুক্ষণের গভীর নীরবতার পর এতটুকু শুধু বললেন,

"کاش علماء اس کام کو سنبھال لیتے پھر ہم چلے جاتے-"

“হায়! উলামায়ে কেরাম যদি এ কাজের দায়িত্ব নিতেন, এরপর আমরা চলে যেতাম।” (দীনী দাওয়াত : পৃষ্ঠা ১৩৪-১৩৫)

হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী পরবর্তীতে দাওয়াত ও তাবলীগের এ মেহনত উলামায়ে কেরামের পরামর্শ ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমেই উন্নতি, অগ্রগতি ও উৎকর্ষ লাভ করেছে। এ বিষয়ে হযরতজীর সমকালীন বুযুর্গানে দীনের রচনাবলীর ভিত্তিতে কিছু তথ্য নিবেদন করা হচ্ছে–

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত : উলামায়ে কেরামের পৃষ্ঠপোষকতা প্রসঙ্গ

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সূচনার ইতিহাস নিয়ে সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ. বিরচিত ‘মাওলানা ইলিয়াস আওর উনকী দীনী দাওয়াত’ (পৃষ্ঠা ৪৮, ৫১, ৫২, ৫৯) পাঠ করার দ্বারা জানা যায় যে, মাওলানা ইলিয়াস রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তান। তিনি পুরো দশ বছর মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী রহ.-এর দরবারে লাগিয়েছেন। এরপর দারুল উলূম দেওবন্দে গিয়ে শাইখুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী রহ.-এর কাছে বুখারী ও তিরমিযী শরীফ পড়েন। শাইখুল হিন্দের নির্দেশক্রমে মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ.-এর হাতে বাইয়াত হন। পরবর্তীতে হযরত সাহারানপুরী রহ.-এর পরামর্শে এবং হাকীমুল উম্মত থানবী রহ.-এর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি দাওয়াতের এ মোবারক কাজ নিয়ামুদ্দীনে শুরু করেন। ফলে দারুল উলূম দেওবন্দ ও শাইখুল হিন্দের ফয়য এবং হযরত সাহারানপুরী ও থানবী রহ.-এর পরামর্শ, পৃষ্ঠপোষকতা এবং দু‘আর বরকতে মাওলানা ইলিয়াস রহ. দাওয়াত ও তাবলীগের এ মহান সূচনা করতে সক্ষম হন। এ কারণে সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ. লিখেছেন, ‘জীবনের শেষ পর্যায়ে হযরত গঙ্গুহী রহ.-এর খলীফাবৃন্দ এবং সমসাময়িক উলামায়ে কেরাম ও অন্যান্য আউলিয়াগণের সাথে হযরতজীর ভক্তি ও মহব্বতের সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ় আকার ধারণ করেছিল। হযরত শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী, শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ বুযুর্গানে দীনের সাথে এমন মহব্বতপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যে, অনেক সময়

বলতেন, এ সমস্ত বুযুর্গানে কেরামকে আমি আমার অস্তিত্বের অঙ্গ হিসেবে মনে করি। (এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন আবুল হাসান আলী নদবী রহ. কৃত 'মাওলানা ইলিয়াস আওর উনকী দীনী দাওয়াত' পৃষ্ঠা ৪৮, ৫১, ৫২, ৫৯)

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত : হযরত থানবী রহ.-এর ভূমিকা

হাকীমুল উম্মত থানবী রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা প্রফেসর হযরত আব্দুল বারী সাহেব রহ. হযরতের তাজদীদী ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের উপর মূল্যবান চারটি কিতাব লিখেছেন– এক. জামিউল মুজাদ্দিদীন, দুই. তাজদীদে মাআশিয়াত, তিন. তাজদীদে তাসাউফ ও সুলূক এবং চার. তাজদীদে তা'লীম ও তাবলীগ।

তা'লীম ও তাবলীগের বিষয়েও যে হযরত মুজাদ্দিদ ছিলেন, চতুর্থ কিতাবটিতে তারও বর্ণনা রয়েছে। এ ব্যাপারে কিতাবচতুষ্টয়ের লেখক আব্দুল বারী সাহেব রহ. বলেন, হযরতের বয়ানসমূহ তো পূর্ণাঙ্গ দীনের সকল বিষয়ের তাবলীগ ও দাওয়াতের এমন একটি ভাণ্ডার, যাতে রয়েছে বিশুদ্ধতা ও স্বচ্ছতা, প্রাজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা, উদ্ভাবন ও সংস্কারমূলক প্রতিভার বিচ্ছুরণ! এবং (কুরআনে কারীমে আয়াত- ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ অর্থ : আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে আহবান করুন জ্ঞানগর্ভ কথা ও উত্তম উপদেশসমূহের দ্বারা এবং তাদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করুন...! সূরা নাহ্ল- ১২৫)-এর মধ্যে প্রাজ্ঞতা, উত্তম উপদেশ প্রদান এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মতবিনিময়ের তাবলীগ ও দাওয়াতের যে তিন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, তার একটি পূর্ণাঙ্গ ও (দীনের মুবাল্লিগ ও দাঈর জন্য) অনুসরণীয় কর্মপন্থা। এমনকি হযরত দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতির সংশোধন করেই ক্ষান্ত হননি; বরং বয়ান ও ওয়াজের মাধ্যমে এ সংশোধনের পরিপূর্ণ একটি বাস্তব নমুনা উম্মতের হাতে তুলে দিয়েছেন। (তাজদীদে তা'লীম ও তাবলীগ; পৃষ্ঠা ১৭০)

হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. বস্তি নিযামুদ্দীনে পিতা ও বড় ভাইয়ের উত্তরসূরী হিসেবে দাওয়াত ও তাবলীগের যে কাজ শুরু করেছিলেন, তা মূলত হযরত থানবী রহ.-এর পরামর্শ, দু'আ ও সমর্থনের মাধ্যমেই উৎকর্ষ লাভ করেছিল। 'আশরাফুস সাওয়ানেহ' (আশরাফ চরিত) গ্রন্থে হযরত থানবী রহ.-এর বেশকিছু চিঠিপত্র রয়েছে, যাতে তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের সাথীদেরকে এ কাজের ব্যাপারে পরামর্শ এবং সুসংবাদ শুনিয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রফেসর আব্দুল বারী রহ. 'তাজদীদে তা'লীম ও তাবলীগ' কিতাবে এ মর্মে বলেন, 'আমি একবার বস্তি নিযামুদ্দীনে হযরত ইলিয়াস রহ.-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। উপস্থিতির দ্বিতীয় দিন 'নূহ' এলাকায় তাবলীগের একটি বড় ইজতেমা ছিলো। হযরত (ইলিয়াস রহ.) আমাকে জোরপূর্বক সাথে নিয়ে গেলেন। দু-তিন দিন সার্বক্ষণিক হযরতের সোহবতে থেকে তাবলীগের কাজ পর্যবেক্ষণ করার সৌভাগ্য অর্জিত হওয়ার পর যখন দিল্লি থেকে সোজা 'থানাভবন'-এ উপস্থিতির সময় হয়ে এলো, তখন হযরত এ কথা বললেন যে, *এ কাজের বরকত মূলত হযরত (থানবী রহ.)-এর দু'আর ফসল!* সাথে সাথে এ কথাও বললেন, *হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আমার সালাম পেশ করবেন। এখানকার কাজের বিবরণ শোনাবেন। এর জবাবে হযরত যা কিছু বলেন, অবশ্যই আমাকে তা লিখে জানাবেন!* আমি যখন হযরতের (থানবীর) দরবারে উপস্থিত হলাম এবং হযরতকে বাংলাওয়ালী মসজিদ থেকে নিয়ে নূহ এলাকা পর্যন্ত দাওয়াত ও তাবলীগের কর্মকাণ্ডের উপর নিজের অভিব্যক্তি পেশ করলাম। তখন হযরত বললেন, *আসল কাজ তো এটাই!* (তাজদীদে তা'লীম ও তাবলীগ : ১৭৩)

হযরত থানবী রহ.-এর এই পৃষ্ঠপোষকতার কারণে হযরতজী ইলিয়াস রহ.-ও দাওয়াত ও তাবলীগের সাথীদেরকে থানবী রহ.-এর জন্য বেশি বেশি কুরআন পাঠ করে তার উদ্দেশ্যে ঈসালে সওয়াবের জন্য, তার কিতাবগুলো পাঠ করার জন্য, তার সোহবতপ্রাপ্ত বুযুর্গানে দীনের সংশ্রব গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিতেন। তিনি এ কথাও বলতেন যে, *হযরত মাওলানা থানবী রহ. বহুত বড় কাজ করেছেন, আমার দিল চায় যে, তা'লীম হবে তার তরীকায়, আর তাবলীগ হবে আমার তরীকায়। এভাবে তার তা'লীম ব্যাপক হয়ে যাবে।* (মালফুযাত; মালফূয নং ৫৭, মাকাতিব হযরত মাওলানা ইলিয়াস : পৃষ্ঠা ১৩৭, মেওয়াতিদের প্রতি প্রেরিত ১নং চিঠি)

হযরত আলী নদবী রহ. বলেন, 'মেওয়াতীদের কাজ এবং এর বাস্তব ফলাফল দেখে বিশেষভাবে যেসব এলাকায় মেওয়াতীরা কাজ করছিল, সেখানকার পরিবর্তন লক্ষ্য করে হযরত থানবী রহ.-এর এই কাজের প্রতি পূর্ণ স্বস্তি অর্জন হয়ে যায়। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. একবার তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে তাবলীগের কাজ সম্পর্কে কিছু নিবেদন করতে বললে তিনি বললেন, 'দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই। দলীল তো কোন জিনিসের সত্যতার জন্য পেশ করা হয়। আমার এই কাজের প্রতি প্রশান্তি অর্জিত হয়ে গিয়েছে। এখন আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। আপনি তো মাশাআল্লাহ নিরাশাকে আশায় বদলে দিয়েছেন।' (দীনী দাওয়াত; পৃষ্ঠা ১০২)

দাওয়াত ও তাবলীগের মেওয়াতী সাথীদের প্রতি লেখা এক চিঠিতে হযরতজী তাদের হিদায়াত দিয়ে লিখেছেন যে, 'হযরত থানবী রহ.-এর জন্য ঈসালে সাওয়াবের খুব এহতেমাম করা কর্তব্য। যে কোন ভাল কাজ করে তাঁকে সাওয়াব পৌঁছাবে। বেশি বেশি কুরআন খতম করবে। এটা জরুরী না যে সবাই একত্র হয়ে পড়তে হবে। বরং প্রত্যেকে এককভাবে পড়া বেশি উত্তম। তাবলীগে বের হওয়ার সওয়াবও অনেক বেশি। তাই এ পদ্ধতিতেও বেশি বেশি সওয়াব পৌঁছাবে।' (মাকাতিব; পৃষ্ঠা ১৩৭, মেওয়াতিদের প্রতি প্রেরিত ১নং চিঠি)

অন্যান্য আকাবির উলামায়ে কেরামের পৃষ্ঠপোষকতা

সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. আওর উনকি দীনী দাওয়াত' গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'হযরত মাওলানার ধারণায় এই সমস্ত বুযুর্গানে দীনের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যন্ত জরুরী ছিল, যা ছাড়া তিনি এই কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ এবং আশঙ্কাজনক মনে করতেন। এই সব বিষয় চিন্তা করেই হযরত মাওলানা প্রথম জামা'আতের সফরের জন্য নিজ মাতৃভূমি কান্ধালাকে নির্বাচন করলেন। কেননা কান্ধালা ছিল সে যুগের একটি বিশেষ ইলমী মারকায এবং তাঁর নিজের শহর। (দীনী দাওয়াত; পৃষ্ঠা ৮০)

এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ইলিয়াস রহ. দাওয়াতের কাজ শুরু করার পর সর্বপ্রথম যখন আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য জামা'আত তৈরি হয়, তখন তিনি এ জামা'আতকে হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ.-এর কাছে প্রেরণ করেন তার পরামর্শ এবং সমর্থন লাভের আশায়। ২৮, ২৯, ৩০ নভেম্বর

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ‘গুড়গাঁও’ জেলার নূহ অঞ্চলে এক বিরাট তাবলীগী ইজতেমা হয়, সেখানে মাওলানা মাদানী রহ. যিনি মজমায় জুমু‘আর নামায পড়িয়েছিলেন এবং মাওলানা কেফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ.-সহ অনেকেই শরীক ছিলেন। (দীনী দাওয়াত : পৃষ্ঠা ১১৫)

বিভিন্ন সময়ে হযরত মাওলানা দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের মশওয়ারার জন্য আকাবিরদের একত্রিত করতেন। যেখানে দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম মাওলানা ক্বারী তাইয়্যেব সাহেব, মাওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেব, দিল্লীর আব্দুর রব মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মাদ শফী’ সাহেব, সাহারানপুর মাযাহিরুল উলূম মাদরাসার নাযেম মাওলানা আব্দুল লতীফ সাহেব, দারুল উলূম দেওবন্দের উস্তাদ মাওলানা ই’যায আলী সাহেব ও শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব, মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী, মাওলানা যফর আহমদ উসমানী রহ.-সহ যুগশ্রেষ্ঠ অনেক আলেম ও বুযুর্গানে দীন উপস্থিত হতেন।

বাংলাদেশে তাবলীগের তত্ত্বাবধানে উলামায়ে কেরামের ভূমিকা

বাংলাদেশে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর পদ্ধতিতে দাওয়াত ও তাবলীগের যে কাজ শুরু হয়েছিলো, সেটাও মূলত থানবী রহ.-এর এক শাগরেদের মাধ্যমেই আল্লাহ তা‘আলা শুরু করেছিলেন। তিনি হলেন মুজাহিদে আযম শামছুল হক ফরিদপুরী (ছদর সাহেব হুযূর) রহ.। ছদর সাহেব হুযূরের খাস শাগরেদ, আমাদের উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা আব্দুল মজীদ (ঢাকুবী হুযূর) রহ.-এর কাছে এ ঘটনা একাধিকবার শুনেছি যে, থানবী রহ.-এর দরবার থেকে বাংলাদেশে আসার পর হযরত ছদর সাহেব রহ. মাওলানা আব্দুল আযীয (কাকরাইলের বড় হুযূর) রহ.-কে হিন্দুস্তানে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শিখে আসার জন্য পাঠান। মাওলানা আব্দুল আযীয রহ. প্রথমত কলকাতা মারকাযে, এরপর দিল্লীর নিযামুদ্দীন মারকাযে হযরতজী ইউসুফ রহ.-এর সোহবতে থেকে এ কাজ শিখে এসে বাংলাদেশে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত আরম্ভ করেন। বাংলাদেশে প্রথম মারকায ছিলো খুলনার উদয়পুর মাদরাসার মসজিদ, যার মুহতামিম ছিলেন বড় হুযূর রহ.-এর শ্বশুর।

দ্বিতীয় মারকায : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে খুলনা জেলার তেরখাদা থানাধীন বামনডাঙ্গায় বড় হুযূরের নিজ গ্রামে।

তৃতীয় মারকায : দক্ষিণবঙ্গের সবচেয়ে বড় দীনী প্রতিষ্ঠান; ঐতিহ্যবাহী জামি‘আ ইসলামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম খুলনা সংলগ্ন তালাবওয়ালী মসজিদ।

চতুর্থ মারকায : চতুর্থ পর্যায়ে মারকায নির্ধারিত হয় লালবাগ শাহী মসজিদে। (তখন ছদর সাহেব রহ. লালবাগ জামি‘আ কুরআনিয়ার মুহতামিম ছিলেন।)

পঞ্চম মারকায : একসময় লালবাগ শাহী মসজিদে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ইজতেমার সুবিধার্থে কেল্লার উত্তর-পশ্চিম দিকে মাঠ-সংলগ্ন খান মুহাম্মাদ মসজিদকে মারকায করা হয়।

ষষ্ঠ মারকায : কিছুদিন পর এখানেও জায়গা হচ্ছিল না। ছদর সাহেব রহ. শহরের ভেতরে বড় মাঠ-সংলগ্ন কোন মসজিদ দেখতে বললেন। তখন রমনা পার্কসংলগ্ন মোঘল আমলে তৈরি মালওয়ালী মসজিদের সন্ধান মিলল; কিন্তু আয়তনে এটি ছিল খুব ছোট। ছদর সাহেব রহ. বললেন, প্রয়োজনে পার্কের জায়গা বরাদ্দ নিয়ে মসজিদ বড় করা যাবে। এটাই মারকায হোক। ছয় উসূলের মেহনতের সেই ষষ্ঠ মারকাযই আজকের ঐতিহাসিক কাকরাইল মসজিদ। এসব মারকাযে তখন মুকীম হিসেবে কেউ থাকতেন না; সবাই আসা-যাওয়া করে কাজ করতেন। একমাত্র বড় হুযূর রহ. সব মারকাযেই একা পড়ে থাকতেন।

ছদর সাহেব হুযূর ও বড় হুযূর রহ. ছাড়াও বাংলাদেশের বহু বড় বড় উলামায়ে কেরাম দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিজেদেরকে ওয়াকফ করে এ কাজকে এগিয়ে নিয়েছেন এবং নিচ্ছেন। মাওলানা হুরমুযুল্লাহ সাহেব রহ., মাওলানা লুৎফুর রহমান সাহেব রহ., মাওলানা আলী আকবর সাহেব রহ., মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব (গফরগাঁও) রহ., মাওলানা আব্দুল ফাত্তাহ সাহেব রহ., মাওলানা মুনীর সাহেব রহ., মাওলানা যুবায়ের সাহেব দা.বা., মুফতী উবাইদুল্লাহ সাহেব দা.বা., মাওলানা রবিউল হক সাহেব দা.বা., মাওলানা ফারুক সাহেব দা.বা., মাওলানা উমর ফারুক সাহেব দা.বা. প্রমুখ তাদের অন্যতম।

এছাড়াও হাটহাজারী, পটিয়া, লালবাগ, ফরিদাবাদ, যাত্রাবাড়ি, রাহমানিয়া, মালিবাগ, কামরাঙ্গীর চর-সহ বাংলাদেশের সমস্ত কওমী মাদরাসার মুরুব্বী, মুহতামিম ও আসাতিযায়ে কেরামের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা এবং নিরলস নেগরানীর ফলে উস্তাদ-ছাত্রদের মাঝে দাওয়াত ও তাবলীগের ঈর্ষণীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কুরবানীর ছুটি এবং প্রথম সাময়িক পরীক্ষা ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার ছুটিতে এসব কওমী মাদরাসা থেকে উস্তাদ ও তালিবে ইলমদের তিনদিন ও সাত-দশদিনের হাজার হাজার জামা‘আত বের হচ্ছে। রমযানের দীর্ঘ ছুটিতে তালিবে ইলমদের হাজার হাজার চিল্লার জামা‘আত বের হয়। এরই বরকতে বাংলাদেশে এখন ২৫ হাজারেরও অধিক সাল লাগানেওয়ালা উলামায়ে কেরাম বিদ্যমান। এছাড়াও দাওয়াতের কাজের প্রতি তালিবে ইলমদের মহব্বত পয়দা করার লক্ষ্যে প্রায় প্রতিটি মাদরাসায় তারতীবের সাথে সাপ্তাহিক ২৪ ঘণ্টার জামা‘আত বের করা ও দৈনিক দশমিনিটের মেহনত জারি আছে।

দ্বিতীয় কারণ : উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করা এবং তাদের সাথে শত্রুতা রাখা

উলামায়ে কেরামের সাথে বিদ্বেষ রাখা অত্যন্ত নাযুক ও ভয়াবহ একটি বিষয়। কেননা, উলামায়ে কেরাম আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ওয়ারিস। কাজেই উলামায়ে কেরামের সাথে বিদ্বেষ রাখা নবীগণের সাথে বিদ্বেষ রাখার নামান্তর। আর নবীগণের সাথে বিদ্বেষ রাখা স্বয়ং আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক বলেন,

من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب

যে ব্যক্তি আমার কোনো বন্ধুর সাথে শত্রুতা রাখে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি! (বুখারী; ৬৫০২)

তাছাড়া হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর চিন্তাধারাও উলামায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করা ছিলো না।

উলামায়ে কেরামের প্রতি হযরতজীর এতোটাই শ্রদ্ধাবোধ ছিলো যে, বাহ্যিক সুন্নাতী লেবাসের কারণে কোনো আওয়ামকে ‘মৌলবী’ বলা হলে এটাকে তিনি ‘মৌলবী’ শব্দের অবমূল্যায়ন মনে করতেন। সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদবীর রহ.-কে লেখা এক চিঠিতে হযরতজী লিখেন, *...নাসরুল্লাহ খান সাহেব মৌলবী নন। বরং পাটওয়ারী। (গ্রামের হিসাবরক্ষক) পাটওয়ারের কাজে সারা জীবন কাটিয়ে দেড়দুই বছর যাবৎ তাবলীগে লেগেছেন। শুধু তাবলীগের বরকতে যা কিছু আল্লাহ তা‘আলা তাকে*

দিয়েছেন তা-ই তার অর্জন। 'মৌলবী'-সংশ্লিষ্ট শব্দ অনেক সম্মানের সাথে যথাযোগ্য স্থানে ব্যবহার করা উচিৎ। অধম বান্দার ব্যাপারে জনাব যদি মশওয়ারা কবুল করেন, তবে অধমের আন্তরিক কামনা যে, মামুলী ও সাধারণ শব্দের বাইরে কোন অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার শব্দের 'বে-কদরী' ও অবমূল্যায়নের নামান্তর।' (মাকাতীবে মাওলানা ইলিয়াস; পৃষ্ঠা ২২)

একবার হযরতজী কাজে জুড়ে থাকা তাবলীগের সাথীদের সম্বোধন করে ইরশাদ করেন, *আমাদের সাধারণ কাজের সাথীগণ যেখানেই যাবে, সেখানকার হক্কানী উলামায়ে কেরাম এবং নেককার লোকদের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করবে। তবে এই উপস্থিতি শুধুমাত্র কিছু হাসিল করার নিয়তেই হতে হবে। এবং তাদেরকে সরাসরি এই কাজের দাওয়াত দিবে না। ঐ সমস্ত উলামায়ে কেরাম যারা দীনী কাজে মাশগুল থাকেন তারা তাদের কাজ তো খুব ভালভাবেই জানেন এবং তাদের কাজের ফায়দা ও অভিজ্ঞতা তাদের সামনে রয়েছে। আর তোমরা নিজেদের এই কাজ তাদেরকে ভালভাবে বুঝাতে পারবে না অর্থাৎ তোমরা নিজেদের কথার দ্বারা এই ইয়াক্বীন দিতে পারবে না যে, এই কাজ তাদের অন্যান্য দীনী কাজের মাশগালা (ব্যস্ততা) থেকে বেশী কল্যাণকর ও ফায়দাজনক। ফলে ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, তারা তোমাদের কথা গ্রহণ করবে না। আর যখন তাদের মুখ দিয়ে একবার 'না' বের হবে, তখন দ্বিতীয়বার তাদের মুখ দিয়ে খুব সহজেই 'হ্যাঁ' বের হবে না। অতঃপর পরিণতি এই হবে যে, তাদের অনুসারী জনসাধারণও তোমাদের কথা শুনবে না। আর এটাও অসম্ভব না যে, স্বয়ং তোমাদের অন্তরেও এই কাজের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যাবে। এই জন্য তাদের খেদমতে শুধুমাত্র কিছু হাসিল করার উদ্দেশ্যেই যেতে হবে। কিন্তু তাদের পরিবেশে খুব সতর্কতা ও মেহনতের সাথে কাজ করতে হবে এবং উসূলসমূহের বেশি থেকে বেশি পাবন্দি করার চেষ্টা করবে। আশা করা যায় এভাবে তোমাদের কাজ এবং এর ভাল ফলাফলের বিষয় এমনিতেই তাদের কানে পৌঁছে যাবে। আর সেটাই তাদের জন্য দাওয়াত এবং তাদের তাওয়াজ্জুহ অর্জনের মাধ্যম হবে। অতঃপর তারা যদি স্বয়ং তোমাদের দিকে এবং তোমাদের কাজের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ (মনোযোগী) হন তাহলে তাদের কাছে এই কাজের পৃষ্ঠপোষকতা এবং দিক-নির্দেশনা দেয়ার দরখাস্ত করবে এবং তাদের ইজ্জত-সম্মানের প্রতি লক্ষ রেখে আদব ইহতেরামের সাথে নিজেদের কথা বলবে।* (মালফুযাতে মাওলানা ইলিয়াস; পৃষ্ঠা ২৯)

যে জামা'আতগুলো সাহারানপুর, দেওবন্দ ইত্যাদি এলাকায় তাবলীগের জন্য যেতো, তাদের ব্যাপারে একবার তিনি এই হেদায়াত পেশ করেন যে, 'কাফেলা তথা জামা'আতের সাথীদের উদ্দেশ্যে এই নসীহত থাকবে যে,

اگر حضرات علماء توجہ میں کمی کریں تو ان کے دلوں میں علماء پر اعتراض نہ آنے پائے، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ علماء ہم سے بھی زیادہ اہم کام میں مشغول ہیں وہ راتوں کو بھی خدمت علم میں مشغول رہتے ہیں جبکہ دوسرے آرام کی نیند سوتے ہیں۔

যদি হযরত উলামায়ে কেরাম এই কাজের দিকে মনোযোগ কম দেন কিংবা অংশগ্রহণ না করেন তাদের অন্তরে যেন উলামায়ে কেরামের প্রতি কোন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত না হয়। বরং এটা বুঝা উচিৎ যে, উলামায়ে কেরাম আমাদের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কাজে মশগুল আছেন, যার ফলে তারা আমাদেরকে সময় দিতে পারছেন না। তারা তো গভীর রজনীতেও ইলমে দীনের খেদমতে মশগুল থাকেন যখন অন্যরা আরামের নিদ্রায় বিভোর হয়ে থাকে।'

এরপর হযরত বলেন, '*তাদের এই কাজের প্রতি অমনোযোগিতাকে নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি বলেই গণ্য করে নিবে যে, আমরা তাদের কাছে আসা-যাওয়া কম করেছি বিধায় এমনটি হয়েছে। এই জন্যই তো যারা বছর বছর ধরে তাদের কাছে পড়ে থাকেন তাদের প্রতি আমাদের চেয়ে বেশী মুতাওয়াজ্জেহ হয়ে থাকেন।'*

অতঃপর তিনি বলেন, '*একজন সাধারণ মুসলমান সম্পর্কেও কোন কারণ ছাড়া বদগুমানী (খারাপ ধারণা পোষণ করা) নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করে। আর উলামায়ে কেরামের উপর প্রশ্ন উত্থাপন (বদগুমানী করা) তো এর চেয়ে অনেক বেশী মারাত্মক ও ভয়ংকর।'*

এরপর বলেন, '*আমাদের তাবলীগের এই তরীকায় মুসলমানকে ইজ্জত করা এবং উলামায়ে কেরামকে ইহতিরাম করা বুনিয়াদী এবং মৌলিক বিষয়। প্রত্যেক মুসলমানকে ইসলামের কারণে ইজ্জত করতে হবে। আর উলামায়ে কেরামকে ইলমে দীনের কারণে অত্যন্ত সম্মান করা কর্তব্য।'*

এরপর বলেন, '*ইলম ও যিকিরের কাজ এখনও আমাদের মুবাল্লিগদের আয়ত্তে আসেনি। এটা নিয়ে আমার খুব চিন্তা হয়। আর এর তরীকা এটাই যে, এই সাথীদেরকে আহলে ইলম এবং আহলে যিকিরগণের নিকট পাঠানো হবে যেন এরা তাঁদের তত্ত্বাবধানে তাবলীগও করে এবং তাঁদের ইলম ও সাহচর্য দ্বারা উপকৃতও হয়।'* (মালফুযাত নং ৫৪)

উলামায়ে কেরামের সাথে বিদ্বেষ পোষণের পরিণাম

হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর শাইখ ও মুরশিদ মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. উলামায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ-পোষণকারীদেরকে সতর্ক করে বলেন,

جو لوگ علماء دین کی توہین اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں ان کا قبر میں قبلہ سے منہ پھر جاتا ہے جس کا جی چاہے دیکھ لے۔

'যে সকল লোক উলামায়ে কেরামের বিষোদ্গারে লিপ্ত হয় এবং আচরণে-উচ্চারণে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, কবরে তাদের চেহারা কেবলার দিক থেকে বিপরীতমুখী হয়ে যায়। যার ইচ্ছা হয় সে যাচাই করে নিতে পারে!' (আশরাফ আলী থানবী রহ., '*আরওয়াহে সালাসা: হেকায়াতে আউলিয়া*' পৃষ্ঠা ২১৫, দারুল ইশাআত করাচী)

হযরত গঙ্গুহী রহ. অতি উঁচুস্তরের বুযুর্গ ছিলেন। আল্লাহর পক্ষ হতে 'কাশ্‌ফ'-এর মাধ্যমে তিনি স্বয়ং বলেন–

حق تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری زبان سے غلط نہیں نکلوائیگا۔

'আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, আমার যবান দিয়ে কোনো ভুল কথা বের করবেন না'। (আশরাফ আলী থানবী রহ., '*আরওয়াহে সালাসা: হেকায়াতে আউলিয়া*' পৃষ্ঠা ২০৬, দারুল ইশাআত করাচী)

কাজেই দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের উদ্দেশ্য কখনই উলামায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হতে পারে না। এ ব্যাপারে সকলেরই সতর্কতা আবশ্যক বলে মনে হয়।

তৃতীয় কারণ : ভুল হয়ে যাওয়ার পরও কারো এতায়াত বা অনুসরণকে ওয়াজিব বলা

মাওলানা সাদ সাহেবের ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে, তিনি আমীরুল মু'মিনীন। দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্য তার হাতে এতায়াত তথা আনুগত্যের বাইয়াত (অঙ্গীকার) হওয়া ওয়াজিব! আর যে ব্যক্তি তার হাতে এতায়াতের বাইয়াত

নিবে না, তাকে কতল করে দেয়া ওয়াজিব এবং এই কতল করতে ইসলামী হুকুমত লাগবে না।

আরো বলা হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেভাবে 'এতায়াত' তথা আনুগত্য করেছেন সেভাবে মাওলানা সাদ সাহেবেরও এতায়াত করতে হবে।

এ বিষয়ে কুরআন-হাদীসের আলোকে নিবেদন হলো– ইসলামী শরীয়তমতে এ জাতীয় শাস্তি বাস্তবায়নের জন্য ইসলামী হুকুমতের কাযী তথা বিচারকের আদেশ লাগবে। জনসাধারনের এ জাতীয় শাস্তি প্রয়োগ করার অধিকার নেই। কেননা, এর দ্বারা অপরাধ হ্রাস হওয়ার পরিবর্তে সহিংসতা বৃদ্ধি পাবে। ভাই ভাইকে কতল করবে...!

আর রাসূলের এতায়াত আর অন্য কারো এতায়াত কখনোই একই রকম হতে পারে না। কেননা, রাসূল ছিলেন ভুলের উর্ধ্বে, তাঁর কাছে ওহী আসত। কাজেই সর্বাবস্থায় তার এতায়াত ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ব্যতীত সাধারণ মানুষ কেউই ভুলের উর্ধ্বে নন। কাজেই অন্যদের ক্ষেত্রে যতক্ষণ সে হকের উপর থাকবে, তার এতায়াত করা হবে। যখন সে না-হক কথা বলবে, তখন আর তাকে মানা জায়েয হবে না। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. বলেন,

قال لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن، وإن كفر كفر، وإن كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة

তোমাদের কেউ যেন কারো এমনভাবে অনুসরণ না করে যে, অনুসৃত ব্যক্তি ঈমান আনলে সে-ও (অনুসরণকারী ব্যক্তি) ঈমান আনে। আর কুফরী করলে সে-ও কুফরী করে। (তাবারানী কাবীর; হা.নং ৮৭৬৪, মাজমাউয যাওয়ায়েদ; হা.নং ৮৫০)

হিজরতের পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনাকে ইসলামী হুকুমত ঘোষণা করলেন, সে যামানায় তিন ধরনের বাইয়াত চালু ছিল। একটি সাময়িক আর দুটি স্থায়ী। স্থায়ী দুটি হল–

এক. দীন শেখা ও আত্মশুদ্ধির বাইয়াত।

দুই. এতায়াতের বাইয়াত অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সমস্ত মুসলমানরা তাকে মানবে। এটাকেই আরবীতে এতায়াত বলে।

তিন. সাময়িক বাইয়াত ছিল বাইয়াত আলাল জিহাদ। সেটা হতো প্রয়োজন সাপেক্ষে জিহাদের সময়। মূল বাইয়াত প্রথম দু'টি।

রাসূলের ইন্তিকাল হয় ১১ হিজরীতে। এরপর আসল খুলাফায়ে রাশেদার যামানা। তখনও আল্লাহর মেহেরবানীতে এই দুই বাইয়াত চালু ছিল। খলীফারা রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন এবং তারা পাক্কা দীনদার ও নবীজীর সোহবতপ্রাপ্ত সাহাবী ছিলেন। এরপর আসল বাদশাহাতের যামানা। তখনও এতায়াতের বাইয়াত চালু ছিল, কেননা তাঁরাও কুরআন-সুন্নাহ দ্বারাই দেশ পরিচালনা করতেন। ফলে জনসাধারণ তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতো। কিন্তু তাদের কাছে কেউ আত্মশুদ্ধির বাইয়াত হতো না, তাদের আখলাক ও দীনদারীও তেমন উন্নত ছিল না, তাই এই বাইয়াত চলে গেল পীর-মাশায়েখদের হাতে। লোকজন আত্মশুদ্ধির জন্য পীর-মাশায়েখদের হাতে বাইয়াত হতো।

১৩৩৮ হিজরীর পরে সালতানাতে উসমানিয়ার পতনের পরে এতায়াতের বাইয়াত বন্ধ হয়ে যায়। কেননা উসমানিয়া খিলাফতের পতনের পরে যে ছোট ছোট রাজ্য বা রাষ্ট্র গঠন হয়েছিল সেগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানরা এতায়াতের বাইয়াত গ্রহণ করত না। কিন্তু আত্মশুদ্ধির বাইয়াত পীর-মাশয়েখদের হাতে তখনও জারি ছিল। এরই ফলশ্রুতিতে মানুষ এখনও দীনের উপর কায়েম আছে। যাই হোক, ইসলামী খিলাফত না থাকায় এতায়াতের বাইয়াত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন যদি কেউ খিলাফতের কর্ণধার না হয়েই জনসাধারণ থেকে এতায়াতের বাইয়াত নেয় তাহলে তা গলত হবে। এতায়াতের বাইয়াত আবার চালু হবে, যখন ইমাম মাহদী আলাইহির রিজওয়ান আসবেন কিংবা অন্য কোনভাবে কোথাও ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা হবে। তবে এ সময় আত্মশুদ্ধির বাইয়াত পীর-মাশায়েখদের হাতে চলতে থাকবে কিন্তু তাঁদেরকে আমীরুল মু'মিনীন বলা হবে না, এটাকে ওয়াজিবও বলা হবে না এবং যদি কেউ বাইয়াত না হয় তাকে কতলও করা হবে না। কারণ, এটা এতায়াতের বাইয়াত না; বরং আত্মশুদ্ধির বাইয়াত।

কাজেই মাওলানা সাদ সাহেবের ব্যাপারে এ কথা বলা যে, *তিনি আমীরুল মু'মিনীন। সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জন্য তার হাতে এতায়াত তথা আনুগত্যের বাইয়াত (অঙ্গীকার) গ্রহণ করা ওয়াজিব! যারা এতায়াতের বাইয়াত হবে না, তাকে কতল করে দেয়া ওয়াজিব–* এটা কুরআন-হাদীস, ইতিহাস ও বাস্তবতার আলোকে সঠিক নয়। আমাদের একশ্রেণীর ভাইয়েরা এখনো এ ভুলের মাঝে নিপতিত। সম্ভবত এ ভুল দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই টঙ্গীর ময়দানে উলামায়ে কেরামের রক্তে তাদের হাত রঞ্জিত হয়েছে...!

চতুর্থ কারণ : তাবলীগের কাজকে ইসলামী হুকুমত কায়েমের উদ্দেশ্যে জিহাদের প্রস্তুতি মনে করে

দাওয়াত ও তাবলীগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই পর্যন্ত তাবলীগের তিন মুরুব্বী (হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ., হযরত মাওলানা ইউসুফ রহ., হযরত মাওলানা এনামুল হাসান রহ.)-এর কেউই একথা বলেননি যে, আমরা আমীরুল মু'মিনীন; আমাদের হাতে বাইয়াত (অঙ্গীকারাবদ্ধ) হওয়া ওয়াজিব বা আমাদের এতায়াত না করলে সে হত্যাযোগ্য। তাঁরা এ কথাও বলেননি যে, আমরা তাবলীগ করতে করতে একসময় জিহাদ শুরু করে দিবো এবং ইসলামী হুকুমত কায়েম করে ফেলব। বরং তাঁরা বলেছেন, এটা দীন শিক্ষা করার একটা রাস্তা, ইসলাম ধর্ম শিক্ষা করার জন্য, ঈমান তাজা করার জন্য, আমল পাকা করার জন্য এটা একটা প্রাথমিক মেহনত। হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহ. দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন,

ক. হযরতজী বলেন,

اپنی اس تحریک کے ذریعہ ہر جگہ کے علماء اور اہل دین اور دنیاداروں میں میل ملاپ اور صلح وآشتی کرانا چاہتے ہیں۔

আমি এই 'তাহরীকের' মাধ্যমে প্রত্যেক জায়গায় উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীন এবং দুনিয়াদারদের মাঝে মেলামেশা ও সৌহার্দ্য-ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে চাই। (মালফুযাত; ১০২ নং মালফুয)

খ. তিনি আরো বলেন, '*আমাদের এই তাবলীগী আন্দোলন দীনী তা'লীম ও তরবিয়ত বিস্তার করা এবং দীনী যিন্দেগী ব্যাপকভাবে প্রচার করার আন্দোলন। আর এর যে উসূল রয়েছে সেগুলো যথাযথভাবে পালন করার মধ্যেই তার কামিয়াবী ও সফলতার রহস্য নিহিত রয়েছে। আর তার যে সমস্ত উসূল রয়েছে এর মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি উসূল এই যে, মুসলমানদের যে তবকার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে হক রেখেছেন সেগুলোকে আদায় করে তার সামনে এই দাওয়াত পেশ করতে হবে। আর মুসলমানদের তিনটি তবকা রয়েছে- এক. হতদরিদ্র শ্রেণী। দুই. উন্নত শ্রেণী (ইজ্জতওয়ালা কিংবা ধনী)। তিন.*

উলামায়ে দীন। তাদের সাথে যে আচরণ করতে হবে তা একত্রে এই হাদীসের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে,

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا و لم يُوَقِّرْ كَبِيرَنَاو لم يبجل علمائنا فَلَيْسَ مِنَّا

যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করল না, বড়দের সম্মান করল না এবং উলামায়ে কেরামের ইজ্জত করল না। সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' (মালফুযাত; ১৩৫নং মালফুয।)

গ. মেওয়াতীদের প্রতি লেখা এক চিঠিতে হযরতজী রহ. লেখেন, *মেরে দোস্তো! তোমাদের (আল্লাহর পথে) বের হওয়ার খোলাসা তিন জিনিসকে যিন্দা করা; যিকির, তা'লীম ও তাবলীগ। অর্থাৎ তাবলীগের জন্য বের হওয়া যেন তাদেরকে যিকির এবং তা'লীমের প্রতি আরও বেশি গুরুত্ববান করে।* (সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ. কৃত 'মাকাতিবে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.; পৃষ্ঠা ১৩৮, মেওয়াতীদের প্রতি লিখিত ১ নং চিঠি)

ঘ. হযরতজী বলেন, '*আমাদের এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হল; সমস্ত মুসলমানদেরকে* جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم *শেখানো (অর্থাৎ ইসলামের পুরা ইলমী ও আমলী নেযামের সাথে উম্মতকে সম্পর্কযুক্ত করে দেয়া।) এটা তো হল আমাদের মূল উদ্দেশ্য*'। এরপর হযরত বলেন,

رہی قافلوں کی یہ چلت پھر اور تبلیغی گشت سو یہ اس مقصد کے لئے ابتدائی ذریعہ ہے، اور کلمہ نماز کی تلقین و تعلیم گویا ہمارے پورے نصاب کی "الف بے تے" ہے۔

বাকি রইল জামা'আতের চলাফেরা এবং গাশত করা; এটা তো হল মূল মাকসাদে পৌঁছার একটি প্রাথমিক স্তর। আর কালিমা ও নামায শিক্ষা সেটা হল আমাদের পুরা নেসাবের আলিফ-বা-তা শিক্ষা করার মত।'

ঙ. হযরজতী আরও বলেন, '*আমাদের তাবলীগের কাজের সাথীদের তিন তবকার লোকদের নিকট তিন উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে যাওয়া উচিৎ। এক. উলামায়ে কেরাম এবং বুযুর্গানে দীনের খেদমতে দীন শেখা ও দীনের ভাল প্রভাব গ্রহণ করার জন্য। দুই. নিজ হতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মাঝে দীনী কথাবার্তা প্রচার করে নিজের দীনের মধ্যে মজবুতি হাসিল করা এবং নিজের দীনকে পরিপূর্ণ করার জন্য। তিন. বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের নিকট তাদের ভাল গুণাবলী গ্রহণ করার জন্য।'* (মালফুযাত : ৮৬নং মালফুয)

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে 'ইকরামুল মুসলিমীন' এবং একটি নিবেদন

দাওয়াত ও তাবলীগের ছয় উসূলের একটি হল ইকরামুল মুসলিমীন। যার সারমর্ম হল, 'বড়কে সম্মান করা, ছোটকে স্নেহ করা, উলামায়ে কেরামকে তা'যীম করা।' বড় আফসোসের কথা যে, ইকরামুল মুসলিমীনের এ সারমর্ম বিশেষত উলামায়ে কেরামকে তা'যীম করা' অংশটি বড় নির্দয়ভাবে টঙ্গীর ময়দানে ভুলে যাওয়া হয়েছে। ফলে নিরীহ আলেম-উলামা ও মাদরাসার তালিবে ইলমদের সাথে ইতিহাসের বর্বরতম আচরণ করা হয়েছে। আরো আফসোসের কথা হলো, বাস্তব ঘটনা আড়াল করতে প্রোপাগাণ্ডা করে নির্যাতিত উলামায়ে কেরামকেই নির্যাতনকারী হিসেবে উপস্থাপন করে সাধারণ মানুষকে আলেমবিদ্বেষী করে তোলা হচ্ছে। এ আফসোস ও শেকায়াত কেবল আল্লাহরই দরবারে...!

আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ। তবে আমাদের মনে হয়, টঙ্গী ময়দানে উলামায়ে কেরামের মর্মান্তিক পরিস্থিতির শিকার হওয়ার পেছনে উল্লিখিত চারটি কারণই নেপথ্যের ভূমিকা রেখেছে।

কী ঘটেছিলো টঙ্গীর ময়দানে?

১. নৃশংস হামলা

মাদরাসার নিরীহ ছাত্র এবং বিভিন্ন মাদরাসার উলামায়ে কেরামের উপর লাঠিসোটা, ইট-পাটকেল, এমনকি ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে। খুঁজে খুঁজে টার্গেট করে নবীর ওয়ারিস আলেম উলামাকে অমানুষের মত পিটিয়েছে। আমাদের মাদরাসাসহ বাংলাদেশের বহু মাদরাসার অগণিত ছাত্র তাদের এই নৃশংসতায় শিকার হয়ে হাসপাতালে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছে। কারো মাথা ফেটে হা হয়ে গেছে। কারো হাত ভেঙ্গে দিয়েছে, কারো পা ভেঙ্গে দিয়েছে, কারো চোখ নষ্ট করে দিয়েছে। টঙ্গী ময়দানের এ নৃশংস হামলায় শুধু নারায়ণগঞ্জেরই ১১২০ জন আহত হয়েছেন। গুরুতর যখমী হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২৪০ জন। নিখোঁজ ৫ জন। (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৪ ডিসেম্বর ২০১৮) ঢাকা শহরের মাত্র ২২টি মাদরাসার গুরুতর আহতদের সংখ্যা হাজারের উপরে। এ তালিকা ব্যক্তি উদ্যোগে করা হয়েছে। ঢাকা শহরের সাধারণ তাবলীগী সাথীদের আহতদের হিসাব শবগুজারির পয়েন্টগুলোতে সংরক্ষিত আছে। তাদের সংখ্যাও দুই হাজার ছাড়িয়ে যাবে। এ তালিকার বাইরেও রয়ে গেছে বহু মাদরাসার আহত তালিবে ইলম ও সাধারণ সাথীগণ।

২. মাল-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া

মাওলানা সাদ সাহেবের অনুসরণকারীরা জোরপূর্বক ময়দানে প্রবেশ করে টঙ্গীর ময়দান থেকে তালেবে ইলমদের ভালো ভালো কম্বল, ব্যাগ, জ্যাকেট, মানিব্যাগ, জুতা সবকিছু নিয়ে গেছে। প্রশ্ন হল, এক মুসলমানের মাল এভাবে ছিনিয়ে নেয়া শরীয়তের মানদণ্ডে কীভাবে বৈধ হলো? বলা হচ্ছে, এগুলো নাকি গনীমতের মাল! অথচ গনীমতের মাল তো কাফেরদের থেকে অর্জিত হয়। অবস্থাদৃষ্টে এ প্রশ্ন উত্থাপন করা মোটেও অসঙ্গত নয় যে, তাহলে কি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের ওয়ারিস উলামায়ে কেরাম তাদের নিকট কাফের হয়ে গেলো?

৩. কুরআনে কারীম এবং দীনী কিতাবপত্রের অসম্মান

টঙ্গীর ময়দানের ভিতরে একটা হিফজখানা আছে। সেখানে সব নাবালেগ বাচ্চারা কুরআন পড়ে। ১লা ডিসেম্বর সাদ সাহেবের অনুসারীরা যে হামলা করলো ঐ দিন ঐ সময় এই নাবালেগ বাচ্চারা কুরআন তিলাওয়াত করছিল। হামলাকারীরা সেখানে গিয়ে উস্তাদ ছাত্রসহ সকলকে বেদম পিটিয়েছে। মাসুম বাচ্চাদেরকে আছাড় মেরেছে। কাউকে পিটিয়ে নদীতে ফেলে দিয়েছে। এর চেয়ে ভয়ঙ্কর কথা, এই বাচ্চাদের যে সারিবদ্ধ কুরআন শরীফ ছিল। হামলাকারীদের হুলস্থুল, ছুটাছুটি ও হামলার কারণে কুরআন শরীফগুলো ছিটকে পড়ে, তারা এর আদবের প্রতি বিলকুল লক্ষ করেনি (নাউযুবিল্লাহ)।

যে সকল মাদরাসার ছেলেরা ইজতেমার কাজের জন্য গিয়েছিল তাদের সাথে অনেক কুরআন-কিতাব ছিলো। ছাত্রদের খানা রান্নারত প্রত্যক্ষদর্শী মাদরাসার বাবুর্চিদের বর্ণনা হলো, হামলাকারীরা এই ছাত্রদের কুরআন-কিতাবগুলো চুলার মধ্যে ফেলে দিয়েছে (ময়দানে তখন অনেকেই রান্না করছিল)!

চিন্তার বিষয় হল, এই নৃশংসতা কি কোনভাবেই ইকরামুল মুসলিমীনের মধ্যে পড়ে...! এটা কি কোনো দীনী মেহনতের দরদী আমীরের শিক্ষা হতে পারে? আরও প্রশ্ন হল, আমীর সাহেব কি এই নৃশংসতার অনুমোদন দিয়েছিলেন? যদি দিয়ে থাকেন, তবে দীনী চেতনা বিরোধী বরং মানবতা বিরোধী এ অনুমোদনে উম্মতের প্রতি তার দরদ কতটা প্রকাশ পেল? আর যদি অনুমোদন না দিয়ে

থাকেন, তবে তো এটা আমীরের 'এতায়াত' পরিপন্থী কাজ হয়ে গেলো...!!

আফসোসের বিষয় হলো, এ নৃশংসতার চিত্র জাতীয় পত্র-পত্রিকা কিংবা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আসেনি। ব্যক্তি উদ্যোগে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীই এ ঘটনার ভিডিওচিত্র মোবাইলে ধারণ করে সামাজিক বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করেছে। বস্তুত উলামায়ে কেরাম সবখানেই আজ নির্যাতিত।

শেষ নিবেদন...

আমরা আমাদের দীনী ভাইদের কাছে বিনীতভাবে নিবেদন করবো, একটু নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করুন যে, উলামায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ, তাদের প্রতি হামলার এ দুঃখজনক ঘটনা এটাই কি দাওয়াত ও তাবলীগের শিক্ষা ছিলো? নিরপেক্ষ অন্তরে আমরা কি ভেবে দেখেছি, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে উলামায়ে কেরামের পৃষ্ঠপোষকতা, ইজ্জত ও সম্মান সম্পর্কে হযরতজী ইলিয়াস রহ.-এর বক্তব্য-সমূহের সাথে এ ঘটনার মিল কতটুকু? উলামায়ে কেরাম যদি না থাকেন, কুরআন-হাদীস যদি না থাকে, তবে কোন জিনিসের তাবলীগ করা হবে? কোন বিষয়ের দাওয়াত দেয়া হবে? দীনী বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক যদি উলামায়ে কেরাম না হন, তবে তো মসজিদের মিম্বর থেকে দীনের বিকৃত ব্যাখ্যা দেয়া হবে...!

এ জন্য এখনও সময় আছে বোধোদয়ের; কুরআন-হাদীসের পাশাপাশি হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার। আমরা দীনী সকল বিষয়ে উলামায়ে কেরামের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের উপর আস্থা রাখি। নামাযের মত দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতেও তাদেরকে ইমাম বানিয়ে তাদের অনুসরণে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় দীনের কাজ করি। তাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ না করি। তাদেরকে অসম্মানও না করি। কোনো ব্যক্তির উপর দাওয়াতের কাজকে নির্ভরশীল মনে না করি। কেননা, দাওয়াত ও তাবলীগের এ শিক্ষা তো সার্বজনীন যে, 'কিছু থেকে কিছু হয় না, সব কিছু আল্লাহ তা'আলা থেকে হয়'! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হক বুঝে তার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

বিন্যাস : মাওলানা মাহমূদুল হাসান ফরিদপুরী
শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

=====================

(২ পৃষ্ঠার পর; সম্পাদকীয়...)

=====================

কীসের নিযামুদ্দীন আর কীসের সাদ সাহেবের এতায়াত! বাস্তবে এ অনুসারীরা মসজিদে-মসজিদে, মহল্লায়-মহল্লায় ও মারকাযে-মারকাযে ঐ বগিসদৃশ আমীরদেরই এতায়াত করে থাকে। আত্মঅহমিকায় টইটম্বুর এ আমীর সাহেবরা সংশোধিত হয়ে গেলে নিযামুদ্দীন কিংবা সাদ সাহেবের এতায়াতী নামে কারো অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এসব আমীর নিজেদের অনুসারীদেরকে তা'লীম দেয় যে, তোমরা দীন পেয়েছো আম-পাবলিকের কাছ থেকে, সুতরাং পাবলিকেরই অনুসরণ করো। ফলে তাদের অনুসারীরা বাল্বকেই মনে করছে আলোর উৎস। অথচ পাওয়ারহাউজ থেকে বিচ্ছিন্ন বাল্ব যে নিজেই অন্ধকারের বাসিন্দা এ সরল ব্যাপারটিও তারা চিন্তা করে দেখে না। অবাক কাণ্ড! হাজার হাজার সাল লাগানেওয়ালা ও কাজের সাথে জুড়ে থাকা উলামায়ে কেরামও আজ তাদের কাছে বহিরাগত!

বস্তুত বিগত কিছুকাল থেকে এ কাজের মূল যিম্মাদারগণের দ্বারা কিছু অসতর্কতা হয়ে গেছে। তারা সরল বিশ্বাসে প্রধান ও আঞ্চলিক মারকাযগুলোতে মেহনতের সাথে যুক্ত সাধারণ সাথীদেরকে শূরা তথা পরামর্শ কমিটিতে এবং বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে সম্পৃক্ত করে নিয়েছেন, পুরোনো সাথী পেলেই তাকে জামা'আতের যিম্মাদার বানিয়ে দিয়েছেন, এমনকি মিম্বরে বয়ানেরও সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু এসব উৎসাহমূলক সুযোগ অনেকেরই হজম হয়নি। সমস্যার গোড়াটি মূলত এখানেই। বর্তমানে এতায়াতের নামে ভিন্ন ফেরকা তৈরি করা এবং উলামায়ে কেরামের সাথে সরাসরি শত্রুতা করা সে বদ-হজমেরই ঢেঁকুর মাত্র। আর ১লা ডিসেম্বর টঙ্গীর মাঠে যে হিংস্রতা প্রদর্শিত হলো সেটা ওই বদ-হজমের অস্থিরতা। এ জাতীয় অনুসারী ও পূর্বসূরী মিলে যে এতায়াত পার্টি তৈরি হয়েছে তাদের বিভ্রান্তি নিরসন অত্যন্ত দুরূহ। কেননা এরা গোমরাহীকে দীন হিসেবে গ্রহণ করেছে।

এ পরিস্থিতিতে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে ভবিষ্যৎ কর্ম-পদ্ধতি, হকের উপর জমে থাকা বর্তমান সাথী এবং আগামী দিনের সত্য-সন্ধানী সাথীদেরকে নিয়ে। বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া সাথীরা যেন ফের এমন বিভ্রান্তির শিকার না হয় এজন্য এখনই সতর্ক হওয়া দরকার এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কর্ম-পদ্ধতিতে কিছু সংশোধনী আনা প্রয়োজন। এ মর্মে নিম্নোক্ত পরামর্শগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে–

ক. শূরা কমিটিগুলোতে পারতপক্ষে গাইরে আলেম সাথীকে অন্তর্ভুক্ত না করা।

খ. উলামায়ে কেরামের সোহবতের রঙ আসেনি এমন গাইরে আলেম সাথীকে মারকাযসমূহে বয়ানের আমল না দেয়া।

গ. অন্তত এক চিল্লা লাগিয়েছে এমন আলেম সাথীর বর্তমানে কোন গাইরে আলেমকে চলতি জামা'আতের যিম্মাদার না বানানো।

ঘ. গাইরে আলেম সাথীকে চলতি জামা'আতের যিম্মাদার বানানোর ক্ষেত্রে তার ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে সহীহ-শুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত ও ফরযে আইন পরিমাণ ইলমের দিকটি লক্ষ্য রাখা।

ঙ. ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন লোক পাওয়া না গেলে সাথীদেরকে বাইরে রোখ না দিয়ে মারকাযে রেখেই তা'লীম-তাবলীগের কাজে মশগুল রাখা।

চ. গাইরে আলেম সাথীদেরকে ছয় উসূলের বাইরে কথা বলার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।

ছ. হযরতজী ইলিয়াস রহ.-এর যামানার মত বর্তমানেও বিজ্ঞ আলেমগণকে বিভিন্ন সময়ে মারকাযসমূহে দাওয়াত করা এবং তাদের কাছ থেকে ইজতিমায়ী নসীহত গ্রহণ করা।

জ. হযরতজী ইলিয়াস রহ.-এর মান্‌শা (মনস্কামনা) অনুযায়ী হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ.-এর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কিতাব মশওয়ারাসাপেক্ষে তাবলীগের নিসাবভুক্ত করা।

ঝ. তাবলীগের সাথীদেরকে নিয়মিত কুরআনশিক্ষা কোর্সে শামিল হয়ে সহীহ-শুদ্ধ কুরআন শিক্ষার ওপর জোর দেয়া।

ঞ. হক্কানী উলামায়ে কেরামের দরসে কুরআন, দরসে হাদীস, দরসে মাসাইল, ইসলাহী মাহফিল ও এ জাতীয় মজমায় শিরকতের জন্য এবং কোন কামেল পীরের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক গড়তে উৎসাহ দেয়া।

সম্মিলিতভাবে ফিকির করলে ইনশাআল্লাহ আরো অনেক বিষয় বেরিয়ে আসবে। তবে সংস্কার কাজে কালক্ষেপণ করা উচিত হবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর দীনের সাচ্চা খাদেম হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

টঙ্গীর ইজতিমা ময়দানে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে

বাংলাদেশের মুসলমানদের প্রতি উলামায়ে হিন্দের খোলাচিঠি

প্রেরক : মাওলানা মুহাম্মাদ যায়েদ মাযাহেরী নদবী

অনুবাদ : মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين

এক করুণ ইতিহাস

সম্প্রতি গোটাবিশ্বেই বাংলাদেশে তাবলীগ জামা'আতের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ একটি বহুল আলোচিত ও সমালোচিত সংবাদ। একদল অপর দলের উপর সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে লাঠি-সোঠা নিয়ে যে ন্যাক্কারজনক আক্রমণ চালিয়েছে ইতিহাসে তা নযীরবিহীন। হাজারেরও বেশী লোক এমনভাবে আহত হয়েছে যে, কারো মাথা ফেটে গেছে, কারো বা হাত ভেঙ্গে গেছে, কারো বা পা। দেখা গেছে, বহু আহত ব্যক্তি ব্যথার চোটে মাটিতে পড়ে গেছে, তবুও তার উপর লাঠিবর্ষণ বন্ধ হয়নি। ঘটনাস্থলের পরে কিছু লোকের প্রাণহানীও ঘটে। বহু লোককে বিভিন্ন অলি-গলি ও বাথরুমের বিল্ডিংয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বহু আহত ব্যক্তি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দিন কাটাচ্ছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। বাংলাদেশের ইতিহাসে ধর্মীয় অঙ্গনে এমন দুঃখজনক ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেনি। সে দিনের এই ন্যাক্কারজনক ঘটনায় হয়তো যমীন কেঁপে উঠেছে, আসমান ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছে এবং মনুষ্যত্ব ও মানবতা চিৎকার করে উঠেছে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, যালেম ও মযলুম, আহতকারী ও আহত উভয়েই একই দল ও একই জামা'আত তথা দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে সংশ্লিষ্ট। সবার মুখেই দাড়ি, মাথায় টুপি এবং গায়ে জামা-পাঞ্জাবী। যাদের সাথে এই যুলুম ও নির্যাতন এবং বর্বরতা ও পাশবিকতার আচরণ করা হয় তারা হলেন উলামা-তুলাবা (মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক), নবীজীর উত্তরাধিকারী এবং নববী ইলমের পতাকা বহনকারী। তাদের সাথে এমন অপমানজনক আচরণ! এমন যুলুম ও নির্যাতন! এমন বর্বরতা ও পাশবিকতা! ভাবতেই গা কাঁটা দিয়ে উঠে। কোন শরীফ ও ভদ্র মানুষের পক্ষে এমনটা ভাবাও অসম্ভব।

বিবদমান দু'দলের মাঝে মীমাংসা করার কুরআনী নির্দেশ

কে যালেম কে মযলুম, কে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কে প্রতিষ্ঠিত না, কে অপরাধী আর কে নির্দোষ তার চূড়ান্ত ফায়সালা ও বিচার তো আল্লাহ পাকের দরবারেই হবে। যালেম মযলুম, অপরাধী ও নির্দোষ যেই হোক সে দিকে না গিয়ে পারস্পরিক মতবিরোধ ও মতানৈক্য এবং বিবাদ ও বিসংবাদের সময় আল্লাহ পাকের নির্দেশ, মুসলমানদের দু'দলে বিবাদ দেখা দিলে তৃতীয় পক্ষ সন্ধি ও মীমাংসার চেষ্টা করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

'যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে।' (সূরা হুজুরাত- ৯)

হাদীসে পাকের মধ্যে নবীজীও যালেম-মযলুম উভয় পক্ষের সাথে কল্যাণকামিতাপূর্ণ আচরণ এবং তাদেরকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। নবীজী বলেন,

اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا

'তোমার ভাইকে সাহায্য করো, চাই সে যালেম হোক কিংবা মযলুম।' (বুখারী, তিরমিযী, জমউল ফাওয়ায়েদ, হা.নং ৬৪২৪)

এই হাদীসে বলা হয়েছে, যালেম মযলুম উভয়কে সাহায্য করো। মযলুমের সাহায্য করা তো স্পষ্ট; কিন্তু যালেমকে সাহায্য করা ও তার প্রতি কল্যাণকামিতার অর্থ হলো, তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা, যুলুমের দীনী-দুনিয়াবী ক্ষতি ও তার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে সন্ধি ও মীমাংসার পথ দেখানো, হাদীসের মর্মার্থ এটিই। অতএব এই জাযবা ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নাযুক এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের তাবলীগী সাথীভাইদের খেদমতে কিছু কথা আরয করছি। যদি সঠিক ও উপকারী মনে হয় তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে আর যদি বেঠিক ও অপকারী সাব্যস্ত হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে মাফ করুন।

হাদীসে পাকের মধ্যে নবীজী বলেছেন,

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ.

'প্রত্যেক আদম সন্তানই গোনাহগার, তবে সর্বোত্তম গোনাহগার তারা, যারা তাওবা করে।' (তিরমিযী, হা.নং ২৪৯৯)

হাদীসের মর্মার্থ হলো, মানুষ মাত্রই ভুল-ক্রটি হতে পারে। তবে এদের মাঝে সর্বোত্তম হলো, যারা নিজের ভুলটুকু বুঝতে পেরে আল্লাহ পাকের দরবারে লজ্জিত হয় এবং তাওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসে। নবীদের উত্তরাধিকারী উলামা-তুলাবা ও মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের উপর সেদিন যে বর্বরোচিত আক্রমণ করা হয়েছে, যে আক্রমণের ফলে তাদের শরীর থেকে রক্ত ঝরেছে, নিঃসন্দেহে তা মারাত্মক অন্যায়। নবীজী বলেছেন,

إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ

'তোমাদের কেউ(প্রয়োজনে)প্রহার করলে সে যেনো চেহারায় প্রহার না করে।' (আবূ দাউদ, মিশকাত, হা.নং ৩১৬)

অপর এক হাদীসে এসেছে,

نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ

'নবীজী চেহারায় প্রহার করা ও দাগ দেয়া থেকে নিষেধ করেছেন।' (ইবনে হিব্বান, অধ্যায় জন্তুর চেহারায় প্রহার করা, হা.নং ২১১৬, মুসলিম শরীফ, ২/২০২)

যেখানে জন্তু-জানোয়ারের চেহারায় মারতে নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের, আবার তাদের মাঝে একটি বিশেষ শ্রেণী তথা উলামা-তুলাবাদের চেহারা, মাথায় আঘাত করে শরীর ক্ষত-বিক্ষত করা ও বিকৃত করে দেয়া আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে কতো জঘণ্য অন্যায়, তা সহজেই অনুমেয়।

উলামাদের সম্মান প্রদর্শন দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতিসমূহের অন্যতম

আমরা যা করেছি নিশ্চয়ই তা দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি এবং আকাবির ও

মুরুব্বীদের হেদায়াতের সুস্পষ্ট লংঘন। তাবলীগের মিম্বার থেকে তো সব সময়ই এই হেদায়াতই দিয়ে আসা হয়-

‘উলামাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনকে আবশ্যক করে নাও। তাদের খেদমতকে সৌভাগ্য এবং তাদের সাক্ষাতকে ইবাদত মনে করো। উলামা-মাশায়েখদের অবজ্ঞা করলে, তাদের সাথে বেয়াদবীমূলক আচরণ করলে তোমার সন্তান-সন্ততি ইলমে দীন থেকে মাহরুম হয়ে যাবে। তোমার বংশে হাফেয, কারী ও আলেমে দীন তৈরী হবে না।

উলামাদের সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু নসীহত

১. হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলেন, ‘মুসলমানের ইযযত রক্ষা করা এবং উলামাদের সম্মান প্রদর্শন করা দাওয়াত ও তাবলীগের বুনিয়াদী উসূল। প্রত্যেক মুসলমানকে ইসলামের কারণে এবং উলামাদেরকে ইলমে দীনের কারণে সম্মান করা উচিত। (মালফুযাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. পৃষ্ঠা ৫৭, মালফুযাত নম্বর ৫৪)

২. হযরত বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত উলামায়ে কেরামের সাথে গভীর সম্পর্ক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত রেসালাতের স্বীকৃতি পরিপূর্ণ হবে না। আলেমদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা জরুরী। অন্যথায় যে কোন সময় মানুষ শয়তানের খপ্পরে পড়ে যেতে পারে। (ইরশাদাত ও মাকতুবাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. পৃষ্ঠা ৮৭)

৩. একবার জনৈক আলেমের কাছে প্রেরিত এক চিঠিতে হযরত লিখেন, ‘হযরতের মতো মুখলিছ ব্যক্তিত্বের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ নিজের জন্য ধ্বংসের কারণ মনে করি। এমন কল্পনা করাও পাপ। হযরতের ব্যাপারে আমার অন্তর পূর্ণ স্বচ্ছ। কেনইবা হবে না, আপনাদের মতো আহলে ইলম উলামা-ত্বলাবাদের মহব্বত করা আমাদের জন্য ফরজ। আপনাদের হক জানা, সম্মান প্রদর্শন করা এবং আপনাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা আমাদের নাজাতের উসীলা। (ইরশাদাত ও মাকতুবাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. পৃষ্ঠা ১১৯)

৪. হযরতজী বলেন, একজন সাধারণ মুসলমানের প্রতিও কু-ধারণা পোষণ করা ধ্বংসাত্মক জিনিস। আর উলামাদের সমালোচনা ও দোষচর্চা করা তো আরও মারাত্মক। (মালফুযাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. পৃষ্ঠা ৫৬)

৫. হযরত বলেন, যাদের মাধ্যমে দীনের নে‘আমত পেয়েছি, তাদের ইহসান ও অনুগ্রহ স্বীকার না করা এবং তাদেরকে মহব্বত না করা মাহরুমীর আলামত। হাদীসে এসেছে,

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ

‘যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহ পাকেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।’ বুঝা গেলো, অনুগ্রহকারীদের অনুগ্রহ স্বীকার না করে আল্লাহ পাকের নে‘আমতের শুকরিয়া আদায় সম্ভব নয়। (মালফুযাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. পৃষ্ঠা ১২৩, মালফুয নং ৫৪)

৬. হযরত বলেন, অন্তরে পূর্ণ শ্রদ্ধাবোধ ও মূল্যবোধ বজায় রেখে উলামাদের থেকে দীন শিখো। মূল্যায়নের দাবী হলো, তাদেরকে নিজের জন্য পরম মুহসিন ও অনুগ্রহকারী মনে করবে। সর্বদা তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন, যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, এই হাদীসের মর্মার্থও এটি।

৭. হযরত বলেন, মুসলমানদের মাঝে তিনটি শ্রেণী রয়েছে। ১. অসহায়-দরিদ্র। ২. স্বাবলম্বী ও সম্ভ্রান্ত। ৩. উলামায়ে দীন। এই তিনো শ্রেণীর সাথে আচরণ কেমন হবে নিম্নোক্ত হাদীসে এই হেদায়াতই দেয়া হয়েছে। নবীজী বলেন,

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَ لَمْ يُجِلَّ عَالِمَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

‘যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না, বড়দের সম্মান করে না এবং আলেমদেরকে শ্রদ্ধা করে না সে আমার দলভুক্ত নয়।’ (মালফুযাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. পৃষ্ঠা ১১২ মালফুযাত নং ১৩৫)

এসব হেদায়াত এ মেহনতের প্রারম্ভ থেকেই আকাবির ও মুরুব্বীদের তরফ থেকে বরাবর করা হচ্ছে।

আলেম ও তালিবে ইলমের ব্যাপারে নবীজীর কিছু বাণী

(*বি.দ্র. নিম্নলিখিত হাদীস দশটির মধ্যে* [...] *বন্ধনীযুক্ত হাদীগুলো অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত*)

[১. এক হাদীসে নবীজী বলেন,

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي.

‘আল্লাহ তা‘আলা যার সঙ্গে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে দীনের গভীর বুঝ দান করেন। আমি তো শুধু বণ্টনকারী, দান করার মালিক তো আল্লাহ তা‘আলা। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭১)]

[২. নবীজী বলেন,

خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই, যে কুরআন শিখে ও শেখায়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫০২৭)]

[৩. এক হাদীসে নবীজী বলেন,

إن العلماء ورثة الأنبياء.

অর্থ : আলেমগণ সকল নবীর ওয়ারিস। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৬৮২)]

[৪. নবীজী বলেন,

فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم.

অর্থ : আবেদের তুলনায় আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব এমন, যেমন তোমাদের সর্বনিম্ন ব্যক্তির তুলনায় আমার শ্রেষ্ঠত্ব। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৬৮৫)]

৫. এক হাদীসে নবীজী বলেন,

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ

‘একজন ফকীহ শয়তানের মুকাবেলায় একহাজার আবেদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী।’ (তিরমিযী; হা.নং ২৬৮১)

[৬. এক হাদীসে নবীজী বলেন,

الا ان الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم

‘মনোযোগ দিয়ে শোন! আল্লাহর যিকির ও যে জিনিস আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয় এবং আলেম ও তালিবে ইলম ব্যতীত দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত অর্থাৎ, আল্লাহর রহমত হতে দূরে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৩২২)]

[৭. এক হাদীসে নবীজী বলেন,

اغد عالما اومتعلما اومستمعا اومحبا ولا تكن الخامسة فتهلك... والخامسة أن تبغض العلم وأهله.

অর্থ : তুমি আলেম হও, অথবা তালিবে ইলম হও, অথবা মনোযোগ দিয়ে ইলম শ্রবণকারী হও, অথবা ইলম ও আলেমদের মহব্বতকারী হও। এ চার প্রকার ব্যতীত পঞ্চম হয়ো না তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। পঞ্চম প্রকার হল, তুমি ইলম ও আলেমদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ কর। (তাবারানী; হা.নং ৭১৫১)]

৮. এক হাদীসে নবীজী বলেন,

أَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ

‘তোমরা সম্মানিত লোকদের ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখো।’ (মুসনাদে আহমদ; হা.নং ২৪৪৭৪, আবূ দাঊদ; হা.নং ৪৩৭৫)

৯. এক হাদীসে নবীজী বলেন,

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ

'কুরআনের ধারক-বাহক ও বৃদ্ধ মুসলমানদের সম্মান করা আল্লাহ তা'আলাকে সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত।' (আবূ দাঊদ; হা.নং ৪৮৪৩)

১০. ফাযায়েলে আ'মাল গ্রন্থের লেখক শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহ. ফাযায়েলে তাবলীগ অধ্যায়ে তারগীব এবং তাবারানী শরীফের সূত্রে হযরত আবূ উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেন, নবীজী বলেন–

'কোন আলেমকে একমাত্র মুনাফিকই তুচ্ছ মনে করতে পারে।'

হযরত শাইখুল হাদীস রহ. এরপর লিখেন, কতক বর্ণনায় এসেছে, নবীজী বলেন, আমার উম্মতের তিনটি বিষয়ের ব্যাপারে আমার ভয় হয়। তন্মধ্যে একটি হলো, আলেমদের সম্মান নষ্ট করা হবে এবং তাদের সাথে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করা হবে। তারগীব গ্রন্থে তাবারানীর সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। (ফাযায়েলে তাবলীগ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ৬২৬)

নবীজীর এই বাণীসমূহ এতোটাই সুস্পষ্ট যে, তা পড়ে যে কেউ আন্দায করতে পারে, একজন হাফেয, কারী ও আলেমে দীনের মর্যাদা কতটুকু। নবীজীর ভাষ্য অনুযায়ী একজন আলেমের মৃত্যু একটি কবীলার মৃত্যুর চেয়েও বেশী বেদনাদায়ক। কেননা আলেমের মৃত্যুতে উম্মতের মাঝে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা পূরণ হবার নয়। নবীর একজন উম্মত হয়ে নবীর নায়েব ও উত্তরাধিকারীদের সাথে যে পাশবিক ও বর্বরতার আচরণ আমরা করেছি, কেয়ামতের ময়দানে নবীজীকে মুখ দেখাবো কী করে আমরা? যদি নবীজী জিজ্ঞেস করেন, তোমাদেরকে তো উলামাদের সম্মান করতে বলা হয়েছে, তোমরা তাদের সাথে এই পশুত্বের আচরণ কেন করেছো? কী জবাব দেবো আমরা?

আহতদের মাঝে বিপুলসংখ্যক ছিলো মাদরাসার নওজোয়ান ছাত্র-তুলাবা, যাদের ব্যাপারে নবীজীর স্পষ্ট বাণী,

مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى يَرْجِعَ

'ইলমের অন্বেষণে যে ঘর থেকে বের হয় ঘরে ফেরা পর্যন্ত সে আল্লাহর রাস্তায় থাকে।' (মিশকাত, কিতাবুল ইলম)

'কেয়ামতের ময়দানে সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তা'আলা আরশের নীচে ছায়া দান করবেন। তন্মধ্যে এক শ্রেণী হলো,

شَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ

'ঐ যুবক যে আল্লাহর ইবাদতে তার যৌবনকাল কাটিয়েছে।' (সহীহ মুসলিম)

আহতদের মাঝে শুভ্র দাড়িবিশিষ্ট, বয়োবৃদ্ধ আলেম এবং সাধারণ মানুষও ছিলেন, যাদের ব্যাপারে নবীজীর বাণী-

'শুভ্র দাড়িবিশিষ্ট কোন বৃদ্ধ যখন আল্লাহ পাকের দরবারে হাত উঠিয়ে দু'আ করে, তখন আল্লাহ তা'আলার লজ্জা হয় তিনি তার দু'আ কবুল করেন এবং তাকে মাফ করে দেন।'

কিন্তু আফসোস ও পরিতাপের বিষয়, সেদিন আমাদের নফস ও শয়তান আমাদের উপর এতোটাই প্রভাব বিস্তার করেছিলো যে, নবীজীর কোন শিক্ষা ও বাণীর প্রতিই আমরা ভ্রুক্ষেপ করিনি। নবীজীর স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী উলামা-তুলাবাদের লাঠিচার্জ করে করে আহত করেছি, কতককে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিয়েছি, যাদের একেকজন হাজার জনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, তাদের লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করেছি, তবুও আমাদের মাঝে একটু ভাবের উদয় হয়নি, একটু অনুশোচনা জাগেনি। দুর্ভাগ্য আমাদের, তাবলীগের আকাবির ও মুরুব্বীদের সবসময়কার হেদায়াত ও নির্দেশনা ভুলে গিয়ে এমন পাষণ্ডতা ও নির্দয়তার পরিচয় দিয়েছি, যার দ্বারা শুধু আমাদের দীন-ধর্মই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, বরং উলামাদের সাথে বেয়াদবীর ফলে আমাদের আগত প্রজন্মের দীনী ভবিষ্যতও বিনষ্ট করেছি। তাদেরকে ইলমে দীনের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা করেছি।

বাংলাদেশের জনগণের কাছে একটি আবেদন

আমি বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের কাছে সবিনয় অনুরোধ করছি, আপনারা উলামা-মাশায়েখ ও আসহাবে মাদারিসের ব্যাপারে বিশ্বাসহারা হবেন না। তারা অতীতেও আপনাদের কল্যাণকামী ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, বর্তমানেও আছেন এবং ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও থাকবেন। অবশ্য তাদের শানে আমাদের থেকে যে বেয়াদবী ও অসৌজন্যমূলক আচরণ প্রকাশ পেয়েছে, অতি দ্রুত তার সুরাহা হওয়া দরকার। তাদের থেকে ক্ষমা নিয়ে আল্লাহকে রাযী-খুশী করা দরকার। অন্যথায় আমাদের জন্য বিরাট ঝুঁকি রয়েছে।

হক্কানী-রব্বানী উলামা-তুলাবা আর ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের উপর যে অকথ্য ও অবর্ণনীয় যুলুম-নির্যাতন করেছি,এর ফলে যে কোন মুহূর্তে আল্লাহপ্রদত্ত আযাবে গ্রেফতার হয়ে যেতে পারি। কেননা এটাতো সত্য যে, এ ঘটনায় বিপুলসংখ্যক উলামা-তুলাবা চরমভাবে আহত ও নির্যাতিত হয়েছেন। হাদীসে এসেছে, নবীজী এক সাহাবীকে সম্বোধন করে বলেন,

اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

'মযলুমের বদদু'আকে ভয় করো। কেননা এ দু'আ ও আল্লাহ পাকের মাঝে কোন পর্দা নেই।' (তিরমিযী শরীফ, আবওয়াবুয যাকাত, হা.নং ৬২১)

এই হাদীসের সারকথা হলো,মযলুমের বদদু'আ থেকে বেঁচে থাকো। কেননা মযলুমের বদদু'আ নিশ্চিত কবুল এবং যালেমের ধ্বংস অনিবার্য। এক হাদীসে নবীজী বলেন,

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّه

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার কতক বান্দা এমন আছেন, যারা আল্লাহর নামে কসম করলে আল্লাহ তা'আলা তা পুরা করেই দেন।' (বুখারী, মুসলিম)

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে, আরওয়া বিনতে উওয়াইছ নামী এক মহিলা বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি. এর উপর জোরপূর্বক জমি দখলের অপবাদ আরোপ করে। এই ঘটনার শেষাংশে আছে, শেষ পর্যন্ত হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি. তাকে বদ দু'আ করেন,

اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِيْ أَرْضِهَا قَالَ: فَمَا مَاتَتْ حَتّٰى ذَهَبَ بَصَرُهَا ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِيْ فِيْ أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِيْ حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ

'হে আল্লাহ! যদি এই মহিলা মিথ্যাবাদী হয় তাহলে (শাস্তিস্বরূপ) তার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নাও এবং তার যমীনেই তাকে মৃত্যু দাও। বর্ণনাকারী বলেন, মৃত্যুর পূর্বে মহিলাটি অন্ধ হয়ে যায় এবং তার মৃত্যু হয় এভাবে যে, একদা সে তার যমীনে হাঁটছিলো হঠাৎ কূপে পড়ে যায় এবং কূপেই তার মৃত্যু হয়। (মুসলিম শরীফ, হা.নং ৪১১০)

হাসপাতালের বিছানায় যেসব নিরীহ ও মযলুম আলেম-ছাত্র এখনো কাতরাচ্ছে তাদের বদদু'আকে অবশ্যই ভয় করা উচিত। আর যারা কষ্ট সহ্য করতে না পেরে শাহাদাত বরণ করেছে তার

ফায়সালা তো আল্লাহ পাকের দরবারেই হবে।

অন্যায়ভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করার ভয়াবহ শাস্তি

মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে, নবীজীর প্রিয়পাত্র বিশিষ্ট সাহাবী হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. এক যুদ্ধে জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করেন, যে বহু সাহাবীকে শহীদ করেছিলো। তাই তিনি ওঁৎ পেতে থাকেন এবং সুযোগ বুঝে তার উপর আক্রমণ করেন। সে তৎক্ষণাৎ কালিমা পড়ে বসে। হযরত উসামা রাযি. ভাবলেন, যুদ্ধের ময়দানে আত্মরক্ষার জন্য হয়তো সে কালিমা পাঠ করেছে। তাই শেষপর্যন্ত তাকে হত্যা করে ফেলেন। নবীজীর কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত নাখোশ হন। হাদীসের শব্দ এই,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاأُسَامَةَ فَسَأَلَهُ لِمَ قَتَلْتَهُ؟ إِلٰى أَنْ قَالَ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

'নবীজী হযরত উসামাকে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞেস করেন, কেন তাকে হত্যা করেছো? তারপর বারবার নবীজী এই কথাই বলেন, কেয়ামতের দিন যখন সে কালিমা পড়া অবস্থায় উঠবে তখন তুমি তার কী জবাব দেবে? চিন্তা করার বিষয়, হযরত উসামা রাযি.-এর হত্যা করাটা ছিলো ইজতিহাদী ভুল, এরপরও নবীজী কতটা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। হযরত উসামা রাযি. বারবার নবীজীর কাছে ক্ষমা চাচ্ছিলেন আর নবীজী একই কথা বলে যাচ্ছিলেন, একজন 'কালিমা-গো' মুসলমানকে তুমি হত্যা করেছো, আখেরাতে এর কী জবাব দেবে তুমি? (মুসলিম শরীফ, হা.নং ২৭৩)

সেদিনের ঘটনায় কতোটা ন্যাক্কারজনকভাবে অত্যন্ত নির্দয়তা ও পাশবিকতার সাথে লাঠিচার্জ করে আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে যেভাবে আহত করা হয়েছে, কতোজনের হাত-পা ভেঙ্গেছে, মাথা ফেটেছে, কতোজন ছটফট করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। তবু যালেমদের অন্তরে একটু দয়া হলো না। হযরত উসামা রাযি. তো ইজতিহাদী ভুল করে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন, যে বহু সাহাবীকে শহীদ করেছিলো, যার এক ওয়াক্ত নামায পড়ারও সুযোগ হয়নি। শুধুমাত্র একবার কালিমা পাঠ করেছে, তবুও নবীজী অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তাহলে এই নিরীহ, দীনদার ও নামায-রোযার পাবন্দ উলামা-তুলাবারা কেয়ামতের ময়দানে যখন রক্তাক্ত অবস্থায় উঠবেন তখন যালেমরা আল্লাহ পাকের কাছে কী জবাব দেবে? আল্লাহ পাক বলেন,

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُه جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَه وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيْمًا

'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (সূরা নিসা, আয়াত : ৯৩)

এক হাদীসে নবীজী বলেন,

لاتَقْتَتِلَنَّ بَعْدِىْ فَإِنِّى ْمُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

'তোমরা আমার পরে একে অপরকে হত্যা করো না। কেননা আমি সমগ্র উম্মতের উপর তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করবো।' (মুসনাদে আহমদ, পৃষ্ঠা ৩৫১, খণ্ড : ৪)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, একজন উম্মতকে হত্যা করার দ্বারা তার থেকে বংশবিস্তারের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে উম্মতের সংখ্যা কমে যাবে। তাই নবীজী মানুষ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। (তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃষ্ঠা ৩১, খণ্ড-১)

বিদায় হজ্জের ভাষণে নবীজী বলেন,

لا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

'আমার পরে কাফেরদের মতো একে অপরকে হত্যা করো না।' (মুসলিম শরীফ, হা.নং ২২০)

নামাযীদেরকে অন্যায়ভাবে প্রহার করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

নবীজী তো উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, নামাযীকে প্রহার করো না। এক হাদীসে এসেছে, একদা হযরত আলী রাযি. খেদমতের জন্য ক্রীতদাসের তালাশে নবীজীর খেদমতে আসেন। নবীজী তাকে একজন ক্রীতদাস দান করেন এবং এই হেদায়াত দেন যে, তাকে মেরো না। কেননা খায়বার থেকে ফেরার পথে আমি তাকে নামায পড়তে দেখেছি। আর আমাকে নামাযীদের মারতে নিষেধ করা হয়েছে। (মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, মাউমাউয যাওয়ায়েদ, পৃষ্ঠা ৪৩৩, খণ্ড :৪)

অপর হাদীসে নবীজী এও বলেছেন,

لا تَسُبُّوا الدِّيْكَ فَإِنَّه يُوْقِظُ لِلصَّلَاةِ

'তোমরা মোরগকে গালি দিও না। কেননা সে নামাযের জন্য লোকদেরকে জাগ্রত করে।' (আবূ দাউদ, জমউল ফাওয়ায়েদ, হা.নং ৬৬৫২)

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়

কিন্তু আফসোস, শত আফসোস, নবীজীর এই অপূর্ব শিক্ষায় আমরা মোটেই ভ্রূক্ষেপ করিনি। আমাদের অত্যাচারের খড়গ থেকে নামাযী, দীনদার, বয়োবৃদ্ধ ও নওজোয়ান কেউ রেহাই পাইনি। আজ কোথায় গেলো আমাদের ঈমান, আর কোথায় গেলো ঈমানী গায়রাত? এমন ন্যাক্কারজনক কর্মকান্ডের মাধ্যমে মূলত আমরা দীন, ধর্ম আর তাবলীগের এ মেহনতকেই কলংকিত করেছি। ভূলুণ্ঠিত করেছি বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের মান-মর্যাদাকে। অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের শান বর্ণনা করেছেন এভাবে,

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ [الفتح: ٢٩]
أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ [المائدة: ٥٤]

'মুমিনগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর।'

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমরা আমাদের শক্তি-সামর্থ্য ও কঠোরতাকে উলামা-তুলাবা আর ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছি। আফসোস, নওজোয়ান ছাত্রদের উপর লাঠিবর্ষণ করার সময় আমাদের অন্তর একটুও কাঁপলো না। তাদের আর্তচিৎকারে আমাদের অন্তরে একটু দয়ার উদ্রেক হলো না। উপর্যুপরি লাঠিবর্ষণ করে আমরা তাদের ক্ষত-বিক্ষত করেছি। রক্তে রঞ্জিত করেছি ইজতেমা ময়দানের পবিত্র ভূমিকে। কোথায় আমাদের সেই ঈমানী সিফাত, কোথায় সেই ঈমানী গায়রাত? ঈমান-ইয়াকীনের মেহনত কি এই শিক্ষাই দেয়? একেই কি বলে ইকরামুল মুসলিমীন? দাওয়াত ও তাবলীগের একশো বছরের ইতিহাসে এমন পাষন্ডতা ও বর্বরতার নযীর পাওয়া যাবে না।

দায়িত্বশীলদের তরফ থেকে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার নিন্দাবাদ জরুরী

দাওয়াত ও তাবলীগের মৌলিক কাজই হলো মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করার পাশাপাশি সৎকাজের আদেশ ও অৎসকাজের নিষেধ করা। কিন্তু এমন ন্যাক্কারজনক, বর্বরতম ঘটনা ঘটে গেলো, প্রকাশ্যে যুলুম-নির্যাতন করা

হলো; কিন্তু তৎক্ষণাৎ কিংবা পরবর্তীতে নেতৃত্বদানকারী মুরুব্বীদের তরফ থেকে কোন নিন্দাবাদ শোনা যায়নি, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। এতো কিছু ঘটে যাওয়ার পরও নীরবতা ও নির্লিপ্ততা এবং যালেম ও অপরাধীদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা না দেয়া কিসের প্রমাণ বহন করে? তারা কি এই ন্যাক্কারজনক ঘটনায় সন্তুষ্ট? যদি তাই না হয় তাহলে নীরবতা কেন? দায়িত্বশীল হওয়ার সুবাদে মুরুব্বীদের তরফ থেকে এই মেহনতের সাথে জড়িত সাথীদের এহেন আচরণের কারণে প্রকাশ্যে নিন্দাবাদ করা জরুরী ছিলো, যেনো এই মেহনত কলংকিত না হয়। কিন্তু এত কিছুর পরও নীরবতা ও নির্লিপ্ততা তাদের সন্তুষ্টির প্রমাণ বহন করে। নবীজী স্পষ্টভাবে হাদীসে বলেন,

إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْئَةُ فِي الْأَرْضِ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا - كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا

'কোথাও শরীয়ত গর্হিত কাজ হলে উপস্থিত কেউ যদি তা অপছন্দ করে তাহলে সে অনুপস্থিত ব্যক্তির মতো। আর অনুপস্থিত কেউ যদি আন্তরিকভাবে তাতে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে সে উপস্থিত ব্যক্তির মতো (গোনাহগার) হবে। (আবূ দাউদ, কিতাবুল মালাহিম, হা.নং ৪৩৩৮)

এই বর্বরোচিত আক্রমণের কারণে অপরাধী ও যালেমদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়া তাবলীগের মুরুব্বীদের শরয়ী দায়িত্ব, যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে তাওবা করে সুপথে ফিরে আসে।

হে বাংলাদেশের মুসলমানগণ! আপনাদের পূর্ব-পুরুষ তো এমন ছিলেন না

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের মাটির পরতে পরতে উলামাভক্তি মিশে আছে। এখানকার আলো-বাতাস সমাজ ও পরিবেশ সর্বদা উলামা-মাশায়েখদের শ্রদ্ধা করেছে। তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন করতে কোনরূপ ত্রুটি করেনি। হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ. এবং শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর পদধূলিতে এখানকার মাটি সিক্ত। তাদের ফুয়ূয ও বারাকাত লাভে ধন্য হয়েছে এ অঞ্চলের বহু মানুষ। বাংলাদেশের ইতিহাস বলে, এ অঞ্চলের লোকজন উলামা-তুলাবা ও আউলিয়া-মাশায়েখভক্ত। আপনারা কি আপনাদের এই সোনালী ইতিহাস ভুলে গেছেন? পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ-অনুকরণ থেকে দূরে সরে গেছেন। আপনাদের পূর্ব পুরুষগণ তো এমন ছিলেন না।

বাংলাদেশের জনগণ উলামা-মাশায়েখভক্ত ছিলো বলেই এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বড় বড় দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এ মাটিতে জন্মেছে হাজারো আলেম, ফাযেল এবং হাফেয ও ক্বারী। এখানকার মিম্বর-মেহরাব আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে সদা মুখরিত। এসব মাদরাসার বদৌলতেই দূর হয়েছে সমাজের সব অনাচার ও কুসংস্কার।

যেখানে একসময় পুরা এক খান্দানের মধ্যেও জানাযা পড়ানোর মতো একজন হাফেয-আলেম পাওয়া যেতো না। সেখানে এই মাদরাসাওয়ালাদের চেষ্টার বরকতে আজ ঘরে ঘরে হাফেয, আলেম তৈরী হচ্ছে, যারা সমাজের সর্বস্তরের লোকদের দীনী জরুরত পুরা করছে।

উলামা-মাশায়েখের হাত ধরেই দাওয়াত ও তাবলীগের এই মেহনত বাংলাদেশের মাটিতে পৌঁছেছে। তাদের তত্ত্বাবধান ও নেতৃত্ব ছিলো বলেই এ মেহনতের সুফল আজ সারা দেশে দেখা যাচ্ছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে তারা আমাদের থেকে মোবারকবাদ পাওয়ার উপযুক্ত। তাদেরকে শ্রদ্ধা করা, তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং আন্তরিকভাবে তাদের মহব্বত করা আমাদের ঈমানী ও নৈতিক দায়িত্ব। নবীজী বলেছেন, যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

কিন্তু পরম আফসোস ও পরিতাপের বিষয় হলো, আমরা আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, কল্যাণকামী ও অনুগ্রহকারী উলামা-মাশায়েখদের সাথে অন্যায় আচরণ করেছি। দিন-দুপুরে খোল্লমখোলা তাদেরকে এমনভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছি, যা বিশ্ব দরবারে আমাদের ও দেশের ভাবমূর্তিকে চরমভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে। গতকাল পর্যন্ত যাদের আমরা হৃদয় দিয়ে ভালবাসতাম, মহব্বত করতাম, যাদের খেদমতকে সৌভাগ্য মনে করতাম এখনো তারা আমাদেরই আপনজন, আমাদের পথ প্রদর্শক। খতনা-বিবাহ, ইমামত ও জানাযা সর্বস্থানে তারা আমাদের দীনী জরুরত পুরা করছে, ভবিষ্যতেও পুরা করবে। নবীর স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী বিধায় গতকাল তারা আমাদের সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, আজও আছেন। একমাত্র আল্লাহর জন্য আমরা তাদের কদর করি, মহব্বত করি এবং নবীজীর নির্দেশ মুতাবেক তাদের ইজ্জত করি। তাদের দিকে মহব্বতের নযরে তাকানোকে ইবাদত মনে করি এবং অন্তরে বদ্ধমূল করে নেই যে, তাদের সাথে বেয়াদবী ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করলে ক্ষতি তাদের হবে না, বরং আমাদের আগত প্রজন্ম ও সন্তান-সন্ততি ইলমে দীন থেকে মাহরূম থাকবে। রাশিয়ার ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সেখানকার জনগণ যখন উলামাদের কদর করেনি, বরং উল্টো যুলুম করেছে, নির্বিচারে হত্যা করেছে, আল্লাহ তা'আলা ইলমের নেয়ামতকে তাদের ভূখণ্ড থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। যেখানে এক সময় ঘরে ঘরে আলেম ছিলো সেখানে আজ জানাযা পড়ানোর মতো আলেম নেই, ইসলাম তাদের কাছে অপরিচিত ধর্ম, লোকেরা নির্দ্বিধায় ধর্ম ত্যাগ করছে। আল্লাহ তা'আলা এমন পরিস্থিতি থেকে আমাদের দেশকে হেফাযত করুন।

বাংলাদেশের মুসলমানগণ! চোখ খুলুন এবং বুঝে-শুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন

হে বাংলাদেশের মুসলমানগণ! নফসের ধোঁকা আর শয়তানের প্ররোচনায় আমরা সে কাজই করে বসেছি, যা করা আদৌ উচিত ছিলো না। কিন্তু এখনো সময় আছে, আল্লাহ তা'আলা সমঝ-বুঝ ও বুদ্ধি-বিবেক দান করেছেন। চোখ খুলুন, ভেবেচিন্তে পূর্ণ বুদ্ধিমত্তার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। আখেরাতকে প্রাধান্য দিন এবং নিজ সন্তান-সন্ততি ও বংশধরের দীনী ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করুন। নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার করুন এবং আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করুন। অন্যায়-অপরাধ যা হয়েছে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, চির দয়াময়। নিরানব্বই ব্যক্তির হত্যাকারীকেও খালেছ তাওবার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। সত্যি সত্যিই যদি আপনি নিজ কৃতকর্মের উপর শরমিন্দা ও লজ্জিত হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে রোনাযারী ও কান্নাকাটি করেন, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আপনাকে মাফ করে দিবেন। নির্জনতা ও একাকিত্বে বসে নিজ অপরাধের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করুন। তাওবা-ইস্তিগফার করতে মোটেও বিলম্ব করবেন না। উদ্ভূত এ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দরদ-ব্যথা এবং

খায়েরখাহী ও কল্যাণকামিতার মনোভাব নিয়ে কুরআন ও হাদীস থেকে সংগৃহিত কিছু করণীয় পেশ করছি, ইনশাআল্লাহ এর উপর আমল করার দ্বারা কল্যাণ আসবে,অকল্যাণ দূরীভূত হবে এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর রহমত বর্ষণ করবেন।

সংকট নিরসনে কিছু করণীয়

১. আল্লাহর দরবারে তাওবা-ইস্তিগফার করুন।

সবার আগে নিজেকে অপরাধী মনে করে দুই রাক'আত তাওবার নামায পড়ি এবং পূর্ণ খুলূস ও লিল্লাহিয়াত, নিষ্ঠা ও আত্মনিমগ্নতার সাথে নিম্নোক্ত দু'আগুলো করতে থাকি–

(١) رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

(٢) لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

(٣) رَبِّ أَوْزِعْنِىْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ

(٤) اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْفِعْلِ وَالْهَدْىِ وَالنِّيَّةِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.

(٥) اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنَا مَرَاشِدَ اُمُوْرِنَا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا.

(٦) اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اتِّبَاعَه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَه

(٧) اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلٰى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ.

অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে নিজের অন্যায়-অপরাধকে চোখের সামনে রেখে উক্ত দু'আগুলো পাঠ করতে থাকুন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে খুব কান্নাকাটি করুন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'আলা মাফ করবেন এবং হেফাযত করবেন।

২. উলামা-ত্বলাবাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

আমার প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! উলামায়ে কেরাম আমাদের অকল্যাণ চান, তারা ভিন্ন, আমরা ভিন্ন, এমন কুচিন্তা মাথা থেকে একেবারেই ঝেড়ে ফেলুন। বিশ্বাস করুন এবং অন্তরে বদ্ধমূল করুন যে, তাঁরা অতীতেও আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ও কল্যাণকামী ছিলেন, বর্তমানেও আছেন। তারাই আমাদের দীনের পথ প্রদর্শক। আগামী প্রজন্মের দীনী ভবিষ্যত তাদের হাতেই নির্মিত হবে। আমাদের যাবতীয় দীনী জরুরত ও ধর্মীয় প্রয়োজন তারাই পুরা করছেন। তাদের খেদমত ও অবদান থেকে আমরা অমুখাপেক্ষী হতে পারি না। যে কোন দীনী প্রয়োজনে তাদের দ্বারস্থ আমাকে হতেই হবে। এসব চিন্তা মাথায় রেখে তাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করা, সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং মহব্বতপূর্ণ আচরণ করা আমাদের কর্তব্য। নফসের ধোঁকা আর শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে যে অপরাধ আমরা করে বসেছি, সে জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। এ ব্যাপারে লজ্জাবোধ করা কিংবা গড়িমসি করা বিলকুল অনুচিত। অন্যথায় আমাদের ধ্বংস অনিবার্য এবং আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যত অন্ধকার।

৩. উলামাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করুন।

আমাদের দেশের উলামায়ে কেরাম নিযামুদ্দীন মারকায এবং সেখানকার মুরুব্বীদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, এমন ধারণাও অন্তর থেকে বের করে ফেলুন। কস্মিনকালেও এমন হতে পারে না। বরং উলামায়ে কেরাম তো সর্বদাই দাওয়াত ও তাবলীগের এ মেহনত এবং নিযামুদ্দীন মারকাযের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। জনগণকে এ মহান মেহনতের সাথে সম্পৃক্ত করার গুরুদায়িত্ব তারাই আঞ্জাম দিয়েছেন। উলামায়ে কেরামের না এই মেহনতের সাথে কোন আক্রোশ ও শত্রুতা আছে, না নিযামুদ্দীন মারকাযের সাথে, আর না সেখানকার মুরুব্বীদের সাথে। অতীতের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, উলামায়ে কেরাম সর্বদা নিযামুদ্দীন মারকায ও সেখানকার মুরুব্বীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেই চলেছেন।

হ্যাঁ, কিছুদিন ধরে নিযামুদ্দীন মারকাযের কিছু অসমীচীন ও অপ্রীতিকর ঘটনাবলী উলামায়ে কেরামকে চিন্তিত করে তুলেছে। মারকাযের মুরুব্বী মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব হাফিজাহুল্লাহর বয়ানসমূহে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা-বিশ্বাসবিরোধী কিছু কথাবার্তা পাওয়া যাচ্ছে, দীনী দায়িত্ববোধের কারণেই উলামায়ে কেরাম তা মেনে নিতে পারছেন না।

হিন্দুস্তানের আকাবির উলামা ও কেন্দ্রীয় দারুল ইফতাসমূহ এ ভুলগুলোর সত্যায়ন করলে বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম সজাগ হন। তারা বাংলাদেশের জনগণের ঈমান-আমল রক্ষার কল্যাণচিন্তায় অত্যন্ত দরদ ও মহব্বত এবং হামদর্দী ও সহমর্মিতার পরিচয় দেন। হিন্দুস্তানের ইলমী ব্যক্তিত্ব, কেন্দ্রীয় দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং দারুল ইফতাসমূহে তারা এই আর্জি পেশ করেন যে, মাওলানা সাদ সাহেব হাফিজাহুল্লার বয়ানসমূহের ব্যাপারে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আশ্বস্ত না হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরাও আশ্বস্ত হতে পারছি না এবং জনগণের দীনী স্বার্থে মাওলানা সাদ সাহেবের ব্যাপারে আমরা সতর্কতার পথ অবলম্বন করবো। এ লক্ষ্যে সুষ্ঠ সমাধানের জন্য বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামের প্রতিনিধি দল একাধিকবার নিযামুদ্দীন মারকায ও দারুল উলূম দেওবন্দ সফর করেন। তারা বারবার এ কথাই বলে যান যে, নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরাম এবং কেন্দ্রীয় দারুল ইফতাসমূহ মাওলানা সাদ সাহেবের বয়ানের ব্যাপারে আশ্বস্ত হলে আমরা পুনরায় তাকে বাংলাদেশের মাটিতে আমন্ত্রণ জানাবো।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মাওলানা সাদ সাহেব হাফিজাহুল্লাহ তাঁর বয়ানের ব্যাপারে আকাবির উলামা ও মুফতীয়ানে কেরামকে পূর্ণ আশ্বস্ত করতে পারেননি। তিনিও একটু তাওয়াযু ও বিনয়ের পরিচয় দিয়ে 'ভরা মজলিসে' আপন ভুলসমূহ থেকে রুজু বা প্রত্যাবর্তন করেননি, যেমন তিনি ভরা মজলিসে ভুলটি প্রচার করেছিলেন। বরং উল্টো তার সমর্থন ও সহযোগীদের তরফ থেকে ভুলের উপর দলীল পেশ করার দুঃসাহস প্রদর্শন করা হয়েছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। এসব কারণে আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দ এখনো তার ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা ও আশ্বস্তি প্রকাশ করেননি। আর এ কারণেই বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম এখনো তার ব্যাপারে আস্থাশীল ও আশ্বস্ত নন।

একটি কথা ভাল করে বুঝে রাখা দরকার যে, মাওলানা সাদ সাহেব হাফিযাহুল্লাহ যে ধরনের ভুল করেছেন তার অধিকাংশই এমন, যা একমাত্র উলামা ও মুফতীয়ানে কেরামই বুঝতে পারেন। সাধারণ মানুষের মাঝে তার নিগুঢ়তা ও সূক্ষ্মতা বুঝার যোগ্যতাই নেই। সুতরাং এসব বিষয়ে সাধারণ মানুষের অন্যায় দখলদারিত্ব বিলকুল অনুচিত। তাদের কর্তব্য হলো, নির্ভরযোগ্য উলামা ও মুফতীদের কথার উপর আস্থা রাখা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। শরীয়তকর্তৃক এই দায়িত্বই তাদেরকে দেয়া হয়েছে।

মাওলানা সাদ সাহেব হাফিযাহুল্লাহর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকিদাবিরোধী কথাবার্তাকে শুধু বাংলাদেশের আলেমগণই নন, বরং হিন্দুস্তান, পাকিস্তানের আলেমগণও অত্যন্ত গভীর আলোচনা-পর্যালোচনা

করে ভুল সাব্যস্ত করেছেন। দারুল উলূম দেওবন্দ, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর, জামি'আ কাসেমিয়া শাহী মুরাদাবাদ, জামি'আ আরাবিয়া হাতুড়াবান্দা তথা কেন্দ্রীয় সকল দারুল ইফতাই এ ধরনের কথাবার্তাকে গলত সাব্যস্ত করেছে।

২০১৮-এর ইজতেমায় মাওলানা সাদ সাহেবকে আসতে না দেয়ার কারণও এটি ছিলো। উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে যা করেছেন, তা উম্মাহর ঈমান-আমলের হেফাযত এবং জনসাধারণকে সঠিক পথে পরিচালিত করার ধর্মীয় তাগিদেই করেছেন। কেননা আল্লাহ পাকের দরবারে জনসাধারণের প্রতিটি বিষয়ে উলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করা হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে তারা বাধ্য। তাদের না মাওলানা সাদ সাহেব হাফিযাহুল্লাহর সাথে কোন আক্রোশ ও শত্রুতা আছে, না নিযামুদ্দীন মারকাযের সাথে। আমরা অতীত থেকেই দেখে আসছি, বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম দাওয়াত ও তাবলীগের সহযোগী ও সমর্থক। নিযামুদ্দীন মারকায এবং সাদ সাহেব হাফিযাহুল্লাহকে তারা নিজেদের মনে করে আসছেন এবং এখনো করছেন। একথা সুনিশ্চিত যে, তাদের অন্তরে মারকায এবং মাওলানা সাদ সাহেব কারো ব্যাপারেই সামান্যতম বিদ্বেষ ও শত্রুতার মনোভাব নেই। শরীয়তকর্তৃক যে দায়িত্ব তারা প্রাপ্ত হয়েছেন, জনগণের কল্যাণের খাতিরে সে দায়িত্বই তারা নিষ্ঠার সাথে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

আপনারা মাওলানা সাদ সাহেব হাফিযাহুল্লাহর জন্য দু'আ করতে থাকুন। হিন্দুস্তানের আকাবির উলামা তার ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বস্ত হলে বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম পুনরায় তাকে পরিপূর্ণ ইকরাম ও মহব্বত এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানাবেন। তাঁর বয়ান দ্বারা মানুষ আবারো উপকৃত হবে।

তাওবা ও মীমাংসার পথ এখনো খোলা আছে

এক হাদীসে এসেছে, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ লুবাবা রাযি. থেকে একটি ভুল হয়ে যায়। তিনি তার এ ভুলে এতটাই শরমিন্দা ও লজ্জিত হয়েছিলেন যে, মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে নিজেকে বেঁধে এ ঘোষণা দেন, আমি অন্তর থেকে আমার এ ভুলের জন্য তাওবা করছি। আর যতক্ষণ পর্যন্ত স্বয়ং নবীজী আমার বাঁধন না খুলবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এভাবেই থাকবো। (তাফসীরে দুররে মানসূর, আয়াত : لَاتَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ, সূরা : আনফাল, তারীখে মাদীনা, পৃষ্ঠা ৩৬)

বাস্তবিক অর্থেই যদি অন্তরে লজ্জা ও অপরাধবোধ থাকে, তাহলে যে কোন কিছু করাই সহজ। আমাদের উচিত, কালবিলম্ব না করে অতি দ্রুত উলামা-তুলাবাদের কাছে গিয়ে গিয়ে নিজের ভুল-ত্রুটি স্বীকার করা এবং তাদের কাছ থেকে ক্ষমা নেয়ার চেষ্টা করা। আমাদের উপর তাদের অবদানকে স্বীকার করে পুনরায় মহব্বতের সম্পর্ক তৈরী করা।

বাংলাদেশের উলামাদের কাছে আবেদন

আমি বাংলাদেশের আলেমসমাজের কাছেও সবিনয় অনুরোধ করছি, এই যে জনসাধারণ, তারা তো আপনাদেরই আপনজন, তাদের ও তাদের সন্তান-সন্ততির দীন ও ঈমান হেফাযতের জন্যেই আপনাদের রাত-দিনের চেষ্টা এবং এতসব মাদরাসা প্রতিষ্ঠা। তাদের যাবতীয় দীনী প্রয়োজন আপনারাই পুরা করছেন। এটা সত্য যে, তারা ভুল করেছে, তাদের তরফ থেকে আমি সুপারিশ করছি, বাস্তবিক অর্থেই কেউ শরমিন্দা ও লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাদের ক্ষমা করে দিবেন এবং কাছে টেনে নিবেন। অন্যথায় তাদের দীন-দুনিয়া সবই বরবাদ হয়ে যাবে।

নাফরমান বেটা পিতার সাথে বেয়াদবী করে যখন মাফ চায় এবং আনুগত্য প্রকাশ করে পিতা তাকে মাফ করে দেন। নবীজী তো হাদীসে বলেছেন,

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِه

'আমি তোমাদের জন্য একজন সন্তানের কাছে তার পিতাতুল্য।' (মিশকাত শরীফ : পৃষ্ঠা ৮)

নবীর উত্তরাধিকারী হিসেবে উলামায়ে কেরামও জনগণের পিতৃতুল্য। সুতরাং সত্যিকারার্থেই যদি তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং পূর্বের ন্যায় শফকত ও মহব্বতের আচরণ করুন।

বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন

সর্বশেষ আমি বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, উলামা-মাশায়েখ ও সাধারণ তাবলীগী সাথীভাইদের মাঝে সৃষ্ট এই বিরোধ নিরসনে আপনাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। যত দ্রুত সম্ভব দীনী দায়িত্ব মনে করে তাদের মাঝে সমঝোতা ও মীমাংসার চেষ্টা করুন। আশা করি, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামের কীর্তি ও অবদান এবং তাদের মান ও মর্যাদা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন। তাদের ইজ্জত ও সম্মান বজায় রেখে তাদের দেয়া পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করুন এবং উলামা ও জনসাধারণের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিকে অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করুন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের এ চেষ্টা নামায-রোযা ও হজ্জ উমরার চেয়েও বেশী ফযীলতপূর্ণ ও ফলদায়ক হবে। এক হাদীসে এসেছে,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالَ : قُلْنَا : بَلٰى قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ

'নবীজী বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রোযা ও সাদকার চেয়েও ফযীলতপূর্ণ কোন আমলের কথা বলে দিবো? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ। নবীজী বললেন, (সে আমল হলো) পরস্পরে সমঝোতা ও মীমাংসা করে দেয়া।' (মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ৪২৮)

আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করেছেন, নিশ্চয়ই তা আল্লাহ তা'আলার এক বড় নেয়ামত। এ নেয়ামতের সঠিক ব্যবহার করে নিজ তত্ত্বাবধানে চলমান এ সংকট নিরসন করুন। আশা করি, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও আপনাদের এ প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। আর আখেরাতের বিরাট প্রতিদান তো আছেই।

নিশ্চয়ই দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত দীনের অত্যন্ত উপকারী ও ফলপ্রসূ একটি মেহনত। এ মেহনতের বদৌলতেই সারা বিশ্বে শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। পরস্পরে মিল-মহব্বত, একতা ও ভালবাসা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং এ মহান কাজে যেনো কোনরূপ বিঘ্নতা সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এ কাজকে আরো ফলপ্রসূ ও বেগবান করার চেষ্টা করুন। এর দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। ছোট-বড়, উলামা ও জনসাধারণের মাঝে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, আনুগত্য ও মহব্বত বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ তা'আলা বাংলাদেশ সরকার ও তার নেতৃবৃন্দকে সবরকম অনিষ্ট থেকে হেফাযত করুন এবং দিন দিন দেশের উন্নতি-অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিকে বৃদ্ধি করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

ওয়াস্সালাম
মুহাম্মদ যায়েদ মাযাহেরী নদবী
উসতাযুল হাদীস ওয়াল ফিক্হ
দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
২৮ রবিউল আউয়াল, ১৪৪০ হিজরী, ৬ই ডিসেম্বর, ২০১৮ ঈসায়ী।

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে টঙ্গী-ময়দানে দশদিনের জোড়ে প্রদত্ত

হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ.-এর বয়ান

বয়ানলেখক : প্রফেসর শেখ আবুল ক্বাসিম

নাহমাদুহূ ওয়া-নুসাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আল্লাহ তা'আলা কাকরাইলের বিশিষ্ট মুরব্বী হাজী আব্দুল মুক্বীত সাহেব রহ.-কে জাযায়ে খায়ের দান করুন। তাঁরই বিশেষ নির্দেশ ও দিক-নির্দেশনায় আমি (শেখ আবুল ক্বাসিম) হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহ.-সহ তিন হজরতজী রহ.-এর বিশেষ সোহবতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট আলেমে দীন ও যুগশ্রেষ্ঠ দাঈ হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ.-এর বাংলাদেশে আগমনকালীন লাগাতার ৯ বছর (১৯৮৮-১৯৯৬) সফরসঙ্গী ও সোহবাতপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর বয়ান ও বাণীসমূহ নিজস্ব বিশেষ শর্টহ্যান্ড কায়দায় কলমবন্দ করার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেছি। সবার নিকট দু'আর দরখাস্ত– আল্লাহ তা'আলা যেন দয়ামায়া করে এ আমানতের যথাযথ হক আদায়ের তাওফীক দান করার পর খাতেমা বিল খায়ের নসীব করেন এবং মদীনা মুনাওয়ারার জান্নাতুল বাকীতে দাফন হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

তাবলীগ জামা'আতের বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতে উত্থাপিত বেশ কিছু জিজ্ঞাসার জবাব থাকায় হযরতের নিম্নলিখিত বয়ানটি অত্যন্ত জরুরী মনে হচ্ছে। বয়ানটি করা হয় বিদেশী মেহমানদের জন্য নির্মিত তাঁবুতে ১৯৮৯ সালে অনুষ্ঠিত দশদিনের পুরানাদের জোড়ে ২৭ আগস্ট, রোববার জোড়ের দশম দিন সকাল ১০:১০ হতে ১২:১০ পর্যন্ত (তরজমা ছাড়া) উর্দূতে। মজমায় উপস্থিত ছিলেন কাকরাইলের উলামায়ে কেরাম, জোড়ে আগত বাংলাদেশের ৬৪ জেলার উলামায়ে কিরাম, হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, আরববিশ্বসহ অন্যান্য দেশ হতে আগত উলামায়ে কিরাম, বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ঢাকা মহানগরী ও টঙ্গীর আশপাশ হতে আগত উলামায়ে কিরাম এবং হাজী আব্দুল মুক্বীত সাহেব রহ.-এর নির্দেশে লেখক হিসেবে পিছনের সারিতে ছিলাম আমি শেখ আবুল ক্বাসিম। আল্লাহ তা'আলা বয়ানের প্রতিটি কথাকে সহীহভাবে বুঝে সহীহভাবে আমল করে উভয় জগতে কামিয়াবী হাসিল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

نحمده ونصلى على رسوله الكريم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ.

অর্থ : গ্রাম্যলোকেরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। তাদেরকে বল, তোমরা ঈমান আননি। তবে এই বল যে, আমরা ইসলামে প্রবেশ (আত্মসমর্পণ) করেছি। ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদের কর্মের (সওয়াবের) ভেতর কিছুমাত্র কম করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। মুমিন তো তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অন্তর দিয়ে স্বীকার করেছে, তারপর কোনও সন্দেহে পড়েনি এবং তাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারাই তো সত্যবাদী। (সূরা হুজুরাত–১৪-১৫)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ

অর্থ : যে ভয় করে আগে আগে রওয়ানা করে, আর যে আগে আগে রওয়ানা করে আগে আগে মনযিলে পৌঁছে যায়। নিশ্চয় আল্লাহর সওদা অনেক দামী। আর আল্লাহর সওদা হল জান্নাত। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৪৫০)

মেরে মুহতারাম বুযুর্গানে দীন!

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে শুধু এক প্রকারের ইলম অবতীর্ণ করেছেন; একাধিক প্রকারের নয়। হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মাধ্যমে দুনিয়াতে যে ইলম এসেছে তা একই ধরণের ইলম। শুরু থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত সব একই ধরণের ইলম।

ইলম আল্লাহ তা'আলা ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করেছেন এবং পর্যায়ক্রমে তা বৃদ্ধি করেছেন। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সময় ইলমের কিছু অংশ অবতীর্ণ করেছেন। হযরত হুদ আলাইহিস সালামের সময় মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, শিল্প ও কারিগরি বেড়েছে, তো ইলমও বেড়েছে। অনুরূপভাবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় কায়-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়েছে, তো ইলমও বেড়েছে। মোটকথা, মানুষ বেড়েছে, হালত বদলেছে, ইলমও বেড়েছে।

এভাবে চলতে চলতে ইলমকে পরিপূর্ণতা দান করা হয়েছে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ–

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ : আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে (চিরদিনের জন্য) পছন্দ করে নিলাম। (সূরা মায়িদা–৩)

যা হোক, বলছিলাম আসমানী ইলম একই ইলম। GEOGRAPHY, (জিওগ্রাফী) GEOMETRY (জিওমেট্রী) প্রভৃতি শাস্ত্র আসমান থেকে আসেনি; জিবরীল আমীন আনেননি। এসব শাস্ত্র হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম আনেননি; বরং এগুলোর জন্য আল্লাহ তা'আলার নেযাম ও ব্যবস্থাপনা অন্য রকম।

বাক্বী তথা চিরস্থায়ী ইলম আল্লাহ তা'আলা জিবরীল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে আম্বিয়া আলাইহিস সালামের কাছে পাঠান। আর ফানী তথা ধ্বংসশীল শাস্ত্রের জন্য মানুষকে একটু আকল-বুদ্ধি দিয়ে দেন। যমীন ফানী, আকল-বুদ্ধিও ফানী। ধ্বংসশীল শাস্ত্রের জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরে আকল-বুদ্ধি দান করেন। আকল-বুদ্ধি কোথায় থাকে?

মস্তিষ্কে, না অন্তরে? আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا

অর্থ : তাদের আছে এমন অন্তকরণ যা তাদের বোধ-বুদ্ধি যোগায়। (সূরা আম্বিয়া-৪৬) বোঝা গেল, আকল-বুদ্ধির স্থান হল অন্তর।

আকল দ্বারা দুনিয়ার ফানী জিনিস থেকে ফায়দা নেয়া হয়। এর দ্বারা মৃত্যুর আগে আগে ফায়দা নেয়া যায়, মৃত্যুর পর আর উপকৃত হওয়া যায় না।

অনুরূপভাবে আকল দ্বারা যে নেযাম কায়েম করা হয়, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের আনীত ইলম সেটাকে মুসাখ্খার করে নেয়, নিজের অধীন করে নেয়। পক্ষান্তরে আকলপ্রসূত জ্ঞান আসমানী ইলমের নেযাম ও ব্যবস্থাপনার কোন কিছুই মুসাখ্খার (অধীন) করতে পারে না।

মনে করুন, খবর আসল ২০০ মাইল গতির প্রচণ্ড এক ঘূর্ণিঝড় ধেয়ে আসছে। এখন এটা রুখে দেয়ার জন্য তোমার কাছে কী ব্যবস্থা আছে? অনুরূপভাবে তোমার জ্ঞান বৃষ্টি-বাদল আনতেও পারে না, রুখতেও পারে না। যেখানে বৃষ্টি হয় না, দেখাও তো সেখানে বৃষ্টি বর্ষিয়ে! পারবে না; রুখতেও পারবে না, বর্ষাতেও পারবে না। এসব ক্ষেত্রে সাইন্স FAIL হয়, আকলও FAIL হয়। কিন্তু এক মুমিনের ইলম বৃষ্টি আনতেও পারে, রুখতেও পারে–

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে খুতবা দিচ্ছেন। বলা হল, বৃষ্টি হচ্ছে না। জীব-জন্তুর কষ্ট হচ্ছে, মানুষেরও কষ্ট হচ্ছে। নবীজী হাত তুলে দু'আ করে দিলেন। অঝোর ধারায় বৃষ্টি শুরু হল। শুরু হল তো হলই! আর থামছে না। আটদিন পর পরের জুমু'আয় নবীজী আবার খুতবা দিচ্ছেন। তো সেই বুদ্দু (গ্রাম্যলোক) আবার বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বৃষ্টি থামছে না। নবীজী দু'আ করলেন, বৃষ্টি থেমে গেল। অনুরূপভাবে বাতাস জোরে প্রবাহিত হলে তিনি দু'আ করতেন, থেমে যেতো। শুধু বৃষ্টি-বাদলই নয়, আসমানী ইলম সবকিছুকেই মুসাখ্খার করে নেয়–

বিলকিসের ভারী তখত। কাঠের না, ভারী পাথরের। বলা হতো, 'আরশুন আযীম' (মহাসিংহাসন)। এ ইলমের তাকতে (শক্তিতে) বহু মাইল দূর হতে তা উঠিয়ে নিয়ে আসা হয় চোখের পলকে। এটা এ ইলমেরই তাকত ও শক্তি।

এ ইলম হক ও না-হকের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়। এ ইলম বাতিলের সমস্ত তরক্কী ও উন্নতি টুকরা টুকরা করে দেয়– কায়সার রুমী যে নহর, বাগান ও প্রাসাদ বানিয়েছিল, তা এই ইলমওয়ালার কব্জায় চলে আসে। অনুরূপভাবে মুকাওকিসের মিশরের সব কিছুই এ ইলমওয়ালার কব্জায় আসে।

এই ইলমের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ইনসানের কামিয়াবী ও নাকামী। এ ইলম ইনসানের যিন্দেগীতে আসল কামিয়াবী নিয়ে আসে। পক্ষান্তরে দুনিয়াবী জ্ঞান কামিয়াবী আনতে পারে না। দুনিয়াবী জ্ঞান তো শুধু কিছু আকৃতি তৈরী করে। দুনিয়াবী ইলম উড়োজাহাজ বানায়, হালাক হয়। মোটর সাইকেল বানিয়ে তা নিয়েই গর্তে পড়ে। বিজলী বানায়, তো বিজলীই তাকে হালাক করে।

আসমানী ইলম কুরআন-সুন্নাহর ইলম। এ ইলম আল্লাহর ইলম। এ ইলমে আল্লাহর সিফাত আছে। এ ইলমে আল্লাহর কুওয়াতে জাব্বারী সবার উপর বিজয়ী হয়। এ ইলম দ্বারা হযরত নূহ আলাইহিস সালাম, হযরত হুদ আলাইহিস সালাম, হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম, হযরত লুত আলাইহিস সালাম, হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম রাযি. সারা দুনিয়ার সকল তাকতের উপর ফাতাহ (বিজয়) আনেন।

কিন্তু এ যামানায় উল্টোটা হচ্ছে। এখন ইলমওয়ালা নিচে আর সাইন্সওয়ালা উপরে। ইলমে ইলাহীওয়ালা নিচে ও যিল্লতে আর দুনিয়ার উলূমওয়ালা উপরে ও ইজ্জতে।

তাহলে কি আল্লাহর বাণী ও ওয়াদা বদলে গেল? না, বদলায়নি। তাহলে কারণ কী? কারণ হল, যে কোন জিনিস তার তাকত (শক্তি) দেখায় নিজ মাকাম ও মাহাওলে। (নিজ অবস্থান ও পরিবেশে)। মোটরের পার্টস যখন যথাস্থানে লাগানো থাকে মোটর তখন শক্তি দেখায়। বাদশাহকে বাদশাহী থেকে সরিয়ে পানের দোকানে বসিয়ে দিলে কি তার যোগ্যতা ব্যবহৃত হবে? হবে না; বরং এক অশিক্ষিত মূর্খও তার চেয়ে ভাল করে পান বেঁচবে। বাদশাহকে বাদশাহর কাজে লাগাও, তাকে সিংহাসনে বসাও, দেখবে তার যোগ্যতা ও কাবেলিয়্যাতের শক্তি।

বাঘকে খাঁচায় আটকে রাখলে সে কি তার তাকত দেখাতে পারবে? পারবে না। বাচ্চারাও তাকে পাথর মারবে, তার সঙ্গে মজাক করবে। পক্ষান্তরে তাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিলে কী হবে?

হযরত উমর রা. ছাগল চরাতেন। তাঁর খালা তাকে মারতেন যে, ছাগলের হিসাব রাখতে পারে না! কিন্তু যখন আমীরুল মুমিনীন হলেন, সারা দুনিয়ার মানুষকে চরিয়ে দেখালেন।

দাওয়াতের যরিয়ায় (মাধ্যমে) সবার উপর প্রভাব হাসিল হয়–

হযরত আমর ইবনুল আস রাযি. যখন মক্কায় ছিলেন, তাঁর যোগ্যতা জাহের হয়নি। যখন তাঁকে মিশর পাঠানো হলো, তিনি স্বল্প সময়ে, মাত্র তিন বকরীর দুধ দোহন করার সময়ে তা জয় করে ফেললেন।

বলতে চাচ্ছি, কুরআন ও সুন্নাহ এখন তার মাহাওলে নেই; তাই তাকত প্রকাশ পাচ্ছে না। উদাহরণত কুরআন ধারণের স্থান কি শুধুই যবান? না, কুরআন ধারণের স্থান পুরো শরীর। কুরআনকে পুরো শরীরে 'ফিট' করলে তার তাকত দেখা যাবে। অনুরূপভাবে যে মাকসাদে (উদ্দেশ্যে) কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, সেটা ছেড়ে এখন তা অন্য মাকসাদে ব্যবহার করা হচ্ছে। কুরআনের মাহাওল (পরিবেশ) কোথায়? সারা আলম ও গোটা বিশ্ব কুরআনের মাহাওল। অনুরূপভাবে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বিবি-বাচ্চা, আয়-উপার্জন এগুলো কুরআনের মাহাওল। এগুলোর প্রতিটিতেই কুরআনের কোন না কোন আয়াত প্রযোজ্য হবে। উদাহরণ নিন–

لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا

অর্থ : যমীনে দম্ভভরে হেঁটো না। (সূরা লুকমান-১৮) এ আয়াত হাঁটাহাঁটিতে প্রয়োগ করতে হবে।

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

অর্থ : হে নবী আপনি মুমিনদের বলুন, তারা যেন নিজেদের চোখ নত রাখে। (সূরা নূর-৩০) এ আয়াত চোখে প্রয়োগ করতে হবে।

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

অর্থ : তোমরা খাও, পান কর, তবে অপচয় কর না। (আ'রাফ- ১৩) এ আয়াত খানাপিনায় এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে অপচয় না হয়।

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

অর্থ: তোমরা যদি আশংকা বোধ কর যে, ইয়াতীমরে ব্যাপারে ইনসাফের সাথে কাজ করতে পারবে না, তবে (তাদেরকে বিবাহ না করে) অন্য নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের পছন্দ হয় বিবাহ কর–

দুই-দুইজন, তিন-তিনজন, চার-চারজনকে। (সূরা নিসা-৩)

এ আয়াত স্ত্রীদের ক্ষেত্রে এমনভাবে প্রয়োগ করা, যাতে আল্লাহর হুকুম না লঙ্ঘন না হয়।

أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

অর্থ : তা (বপিত বীজ) কি তোমরা উদ্গত কর? না আমিই তার উদ্গাতা! (সূরা ওয়াকিয়া -৬৪) এই ইয়াকীন ও বিশ্বাসের সাথে ক্ষেত-খামার করলে কুরআনের তাকত প্রকাশিত হবে।

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

অর্থ : নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি পরীক্ষা স্বরূপ। এবং আল্লাহর কাছে আছে মহাপ্রতিদান। (সূরা তাগাবুন-১৫) এ আয়াত ধন-সম্পদ ও সন্তানাদিতে জারী করে দেখাতে হবে।

কুরআন তো সারা দুনিয়ার নেযামের সাথে তাআল্লুক (সম্পর্ক) রাখে আর আমরা তা ঘরের ভেতর রেখে দিয়েছি। এ-ই কারণ যে, কুরআনওয়ালা নিচে এসেছে এবং দুনিয়ার ইলমওয়ালা– যাদের ইলমের কোন দাম নেই –উপরে উঠে গেছে।

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ،

অর্থ : উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। (সহীহ বুখারী; হা. নং ১৭৪১)

কুরআনের দাওয়াত নিয়ে যদি চল, উপরে উঠে যাবে। যখন দাওয়াত ছেড়ে দিয়ে শুধু পড়ালেখায় লেগেছি, তখন থেকে নিচে নেমেছি। আজ নামায পড়ে বাতেলের খেলাফ দু'আ করা হয়, অ্যাটম বোম থেকে বাঁচার জন্য দু'আ করা হয়– আল্লাহ বলেন, তোমার উপরই ফেলব।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

অর্থ : হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, যখন তোমরা ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে পুরোপুরি মশগুল হয়ে যাবে এবং গরুর লেজ ধরে খেত-খামারে মগ্ন হয়ে যাবে আর জিহাদ করা ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দিবেন, যা তোমরা আপন দীনের দিকে ফিরে না আসা পর্যন্ত দূর হবে না। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৪৬২)

আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার মেহনত ছেড়ে দিলে আল্লাহ যিল্লত দিবেন। ঐ যিল্লত নামায, দু'আ দ্বারা দূর হবে না। তখনই দূর হবে, যখন কালেমা বুলন্দ করার মেহনত করবে।

নবীজী বলেন, এক যমানা আসবে, কাফেররা মুসলমানদের হালাক করতে পরস্পরকে ডাকবে– আসো, আসো। ঠিক যেমন দাওয়াত খাওয়ানেওয়ালা মেহমানদেরকে ডাকে। বলা হল, তখন কি মুসলমান সংখ্যায় কম হবে? নবীজী বলেন, না সংখ্যায় অনেক হবে। তবে তাদের ঈমান ও আমল দুর্বল হবে। নবীজী আরও অগ্রসর হয়ে বলেন,

بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ،

অর্থ : বরং তোমরা সেদিন সংখ্যায় অনেক হবে, তবে তোমরা হবে বানের পানিতে (ভাসতে থাকা) খড়কুটার মত...। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৮২৯৭)

নবীজী আরও বলেন, সে সময় আল্লাহ দুশমনের দিল থেকে তোমাদের প্রভাব বের করে দিবেন। আর তোমাদের দিলে 'ওয়াহান' ঢেলে দিবেন। বলা হল, 'ওয়াহান' কী জিনিস? বললেন, দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর ভয়।

আল্লাহ আগে দেন দাওয়াত, তারপর দেন আহকামাত। অর্থাৎ আগে দাওয়াত দ্বারা ঈমান মজবুত হলে আহকামাতের উপর চলা সহজ হবে।

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

অর্থ : হে বস্ত্রাবৃত! ওঠ এবং মানুষকে সতর্ক কর। এবং নিজ প্রতিপালকের তাকবীর বল (মহিমা ঘোষণা কর)। এবং নিজ কাপড় পবিত্র রাখ। এবং অপবিত্রতা হতে দূরে থাক।... (সূরা মুদ্দাসসির–১-৫)

বোঝা গেল, আগে দাওয়াত তারপর আহকামাত। দাওয়াত দ্বারা–

১. আহকামাতের উপর চলা সহজ হবে।

২. দীন ছড়িয়ে পড়বে; কাঁচা ঘরে ও পাকা ঘরে।

৩. দিলে জোড় পয়দা হবে।

৪. বাতেল ভাঙবে এবং হক গালেব হবে।

৫. গায়েবী নেযাম মুয়াফেক (অনুকূল) হবে। ফেরেশতা, বাতাস, সমুদ্র, দরিয়া, যমীন সবকিছু অধীন হবে।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. ১০ হাজার লশকর নিয়ে দরিয়া পার হন। হযরত উমর রা. হাজার মাইল দূর থেকে ইয়া সারিয়া! আল জাবাল!! আল জাবাল!!! বলে খবর পাঠান।

ইলমের মধ্যে এই শক্তি আছে। তবে ইলম তার তাকত ও শক্তি দেখাবে– চোখের সাথে সম্পৃক্ত আয়াত চোখে, কানের সাথে সম্পৃক্ত আয়াত কানে, যবানের সাথে সম্পৃক্ত আয়াত যবানে, মালের সাথে সম্পৃক্ত আয়াত মালে, বিবির সাথে সম্পৃক্ত আয়াত বিবির উপর, বাচ্চার সাথে সম্পৃক্ত আয়াত বাচ্চার উপর, তেজারতের সাথে সম্পৃক্ত আয়াত তেজারতে, কৃষির সাথে সম্পৃক্ত আয়াত কৃষিতে প্রয়োগ করা হলে।

ইলমে ইলাহীকে যখন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে এবং যিন্দেগীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঠিক ঠিক প্রয়োগ করবে, তখন এ ইলম তার তাকত দেখাবে।

ইলমের মধ্যে তাকত আসবে দাওয়াত দ্বারা। অনুরূপভাবে যিকিরে, নামাযে, মু'আমালাতে, মু'আশারাতে, আখলাকে মোটকথা সকল আমলে তাকত আসবে দাওয়াত দ্বারা।

আমরা আজ একথা বুঝতে পারি না যে, যখন দাওয়াত বের হয়ে যাবে তখন ইলম না জুড়ে লড়াবে, সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিবে। এমনকি ইলমওয়ালা ইলমের ব্যবহারও জানবে না।

আমি তখন মেশকাত জামা'আতে পড়ি। গ্রামে এক মৌলভী সাহেব মসজিদের ইমাম। একবার তিনি মুসল্লীদেরকে বললেন, মহিষ মরে গেলে চামড়া হালাল। মুসল্লীরা একে তো জাহেল, তার উপর আবার পাঠান। ক্ষেপে গিয়ে বলে, আরে! মৌলভী তো হারামকে হালাল করে দিল! এদিকে মুচি বলে, মৌলবী তো আমার হকটাই মেরে দিল!! একপর্যায়ে সবাই মিলে মৌলভী সাহেবকে মারতে তৈরি। মৌলভী সাহেব বললেন, আগে যাচাই করো, যদি ভুল বলে থাকি তখন না হয় মেরো। পরদিন ছিল জুম'আবার। আমি মসজিদের গেলে সবাই আমার সামনে মাসআলা পেশ করে। আমি বলি, আগে জুম'আ, পরে মাসআলা। নামাযের পর সব শুনে বেহেশতী যেওর নিয়ে গেলাম। তারপর মৌলভী সাহেবকে সম্বোধন করে বললাম, মৌলভী সাহেব! মাসআলা শেখাবার পরিবেশ তৈরী করেছিলেন? বললেন, না। বললাম, মুসল্লীদেরকে নিয়ে গাশতে গেলে তাদের মধ্যে হক কবুল করার যোগ্যতা পয়দা হতো। মৌলবী সাহেব নিজের গলত স্বীকার করায় সবাই খুশী। তারপর মুসল্লীদেরকে লক্ষ্য করে বললাম, আপনারা কি সবাই আলেম? বলল, না, আলেম নই, আমরা তো জাহেল। বললাম, এই যে দেখুন,

বেহেশতী যেওরে এই মাসআলা আছে। এবার সবাই ঠাণ্ডা।

যা হোক, বলছিলাম, আগে যোগ্যতা পয়দা করতে হবে। যোগ্যতা পয়দা না করেই কুরআন-সুন্নাহ শুনিয়ে দেয়া নিয়মের খেলাফ। একথা হাদীসেও আছে। হযরত আবূ হুরাইরা রা. নবীজীর জুতা মোবারক নিয়ে হাদীস শোনাতে গেলেন, আর হযরত উমর রা. তাকে বারণ করে বললেন, উম্মতের একথা হজম করার ইস্তি'দাদ (যোগ্যতা) হয়নি!

বলছিলাম, আগে ইস্তি'দাদ পয়দা করতে হবে। আর মাসআলা-মাসাইল নিজেরা মুত্তাফিক হয়ে, একমত হয়ে তারপর আওয়ামকে জানাতে হবে। নয়তো উম্মত টুকরা টুকরা হয়ে যাবে।

১. উম্মতের মধ্যে যে পর্যন্ত কোন কথার ইস্তি'দাদ না হয়, ঐ পযন্ত ঐ কথা না বলা।

২. কিছু জিনিস আছে যে ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম খামুশ-নীরব; ঐ সব নিয়ে হৈ-চৈ না করা। এ ধরনের যত মাসআলা আছে যেগুলোতে সাহাবায়ে কেরাম খামুশ, আমাদেরও সেগুলোতে খামুশ থাকা উচিত।

৩. হ্যাঁ, সাহাবাদের যমানায় যে সব মাসআলা আমভাবে বলা হয়েছে, তা বলতে কোন অসুবিধা নেই।

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

অর্থ : আল্লাহর রশিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ এবং পরস্পরে বিভেদ করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ রাখ। একটা সময় ছিল, যখন তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরসমূহকে জুড়ে দিলেন। (সূরা আলে ইমরান-১০৩)

অন্যত্র বলেন, (অর্থ:) হে নবী! সারা দুনিয়ার মাল খরচ করলেও তুমি উম্মতের দিলগুলো জুড়তে পারতে না। সুতরাং গোটা উম্মতকে জুড়তে চাইলে এর পন্থা হল, তাদেরকে দাঈ বানাও। দাঈ হলেই তারা তোমার সাথে জুড়ে যাবে। বেলাল হাবশী রা., সুহাইব রুমী রা., সালমান ফারসী রা. সবাই জুড়ে গেছেন। ব্যবসায়ী, কৃষিজীবী, জমিদার, চাকুরে, শাসক, সবাইকে জোড়া যাবে দাওয়াত দ্বারা। দাওয়াত নিয়ে চললে সবাই তোমার হবে। নয়তো এরা বাতিলের সম্পদ হয়ে বাতিলের নেযাম দ্বারা তোমাকে রুখে দিবে।

দাওয়াতের যরিয়ায় চলো এবং দাওয়াতের যরিয়ায় সবকিছুকে নিজের করে নাও। আমি যখন (মদীনায় মুনাওয়ারায় অবস্থিত) মসজিদে নূরের বুনিয়াদ স্থাপন করি। লোকজন পয়সা দিতে আসে। বড় বড় অফিসার আসে। বলি, পয়সা না, তোমরা হাত লাগাও, কায়িক শ্রম দাও। একেকজন ২/২ ঘণ্টা করে কাজ করে। হজ্জের মৌসুম ছিল। বড় বড় আলেমগণও হাত লাগায়। হজরতজী ইউসুফ সাহেব রহ. আমাকে বললেন, এই মসজিদ চালানোর জন্য কোন ওয়াকফ সম্পত্তি গ্রহণ করবে না। বাড়ি, জমি, দোকান ওয়াকফ নিবে না। কারণ, মসজিদ শানদার হলে সবাই বলবে– আমাকে নাযেম বানাও, সভাপতি বানাও ইত্যাদি।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক বেশভূষা এবং ধন-সম্পদ দেখেন না, বরং তোমাদের অন্তর এবং আমল দেখেন। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৫৬৪)

আমি বলি, আল্লাহ শুধু আমাদের চেহারাই না, আমাদের মাদরাসা, আমাদের বাড়ির চেহারাও দেখেন না। সাদেগী ও সরলতা– যা ইসলামের সৌন্দর্য –আজ উঠে গেছে। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মিনার বানিয়েছে ফেরাউন। সে এটা বানিয়েছিল হযরত মুসা আলাইহিস সালামের রব্ব আল্লাহকে দেখার জন্য। সুতরাং যাহেরী ঠাঁটবাট নয়, সাদেগী দেখাও, তাকওয়া-তাওয়াক্কুল দেখাও। ছাত্রদের মধ্যে, মাদরাসায়, মসজিদে, সুন্নাত দেখাও। কোন অসুবিধা হলে মাদরাসা থেকে চাইব না, মাখলুক থেকে চাইব না; আল্লাহর কাছে চাইব। তিনিই ব্যবস্থা করে দিবেন।

উম্মতের মধ্যে দীন আসছিল দাওয়াতের যরিয়ায়। দাওয়াত ছাড়া আমল হলে আমলের জান বের হয়ে যায়। নামায থেকে খুশু বের হয়ে যায়। রোজা থেকে তাকওয়া বের হয়ে যায়। যাকাত থেকে গরীবের মহব্বত বের হয়ে তাদের প্রতি হেকারত (তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য) চলে আসে। আজ হজ্জ থেকে 'কুল্লু মুসলিমিন ইখওয়া' (সকল মুসলিম ভাই-ভাই) বের হয়ে গেছে। কাজেই উম্মতকে দাওয়াতের ময়দানে বের করো, উম্মতের মধ্যে হেদায়েত আসবে। দাওয়াতের যরিয়ায় যত বেশি হেদায়াতের মেহনত করব, আওয়ামের মধ্যে তত হেদায়াত বাড়বে, ইসলামী তরীকা আসবে। তাদের মু'আমালাত ঠিক হয়ে যাবে, মু'আশারত ঠিক হয়ে যাবে, ঈমান দ্বারা দিল মুনাওয়ার হয়ে যাবে। তখন তারা বলবে, কেউ আমার হক নষ্ট করে করুক, আমি কারো হক নষ্ট করব না। কাউকে গালি দিলে তখন তার পা ধরে মাফ চেয়ে নিবে।

দাওয়াত সমস্ত দুনিয়ার জন্য রহমত।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.

অর্থ : হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর নির্দেশে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবানকারী ও আলো বিস্তারকারী প্রদীপরূপে। (সূরা আহ্‌যাব–৪৫-৪৬)

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

অর্থ : (হে নবী!) বলে দাও, এই আমার পথ, আমিও পরিপূর্ণ উপলব্ধির সাথে আল্লাহর দিকে ডাকি এবং যারা আমার অনুসরণ করে তারাও। (সূরা ইউসুফ–১০৮)

مَنِ اتَّبَعَنِي (যারা আমার অনুসরণ করে) এর মধ্যে সব এসে গেছে। মহিলা-পুরুষ, আলেম, গায়রে আলেম, কম জাননেওয়ালা, বেশি জাননেওয়ালা সবাই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

عَلَى بَصِيرَةٍ এর মর্ম হল, এই কাজকে হক জেনে, ইয়াকীনের সাথে করে।

ইসলামের শুরুতে তা'লীম ছিল তাওহীদ ও আখলাকের। হযরত জাফর ইবনে আবূ তালিব রা. নাজাশীর সামনে যেমনটি বয়ান করেছিলেন।

আজ লোকেরা মনে করে, মসজিদ ছাড়া আবার দাওয়াত কেমনে? আরে! হযরত নূহ আলাইহিস সালামের তো মসজিদ ছিল না, তিনি দাওয়াত দিয়েছেন। হযরত হুদ আলাইহিস সালামের মসজিদ ছিল না, তিনিও দাওয়াত দিয়েছেন। এমনিভাবে হযরত লুত আলাইহিস সালাম, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, হযরত শু'আইব আলাইহিস সালাম, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এমনকি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মক্কী যিন্দেগীতে মসজিদ ছাড়াই দাওয়াত দিয়েছেন। হযরত মুস'আব ইবনে উমায়ের রা. বিনা মসজিদে মদীনায় দাওয়াত দিয়েছেন। দাওয়াতের জন্য মসজিদ শর্ত না। মসজিদ তো তা'লীম-তা'আল্লুম (শেখা-শেখানো) ও নামাযের ঘর। দাওয়াতের ময়দান তো সারা দুনিয়া।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে কথা বলার আগে শ্রোতাকে আগ্রহী করে তোলা। হযরত

আবূ বকর সিদ্দীক রা. বলতেন, আমার সাথে একজন নবী আছেন, তিনি আপনাকে কিছু কথা বলবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে কথা বলতেন– আল্লাহ আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন। আমি তাওহীদের কথা বলি। আমাকে আপনার কবীলায় নিয়ে চলুন...।

একবার এক এসপি সাহেব ৩ দিনের জন্য ভিন্ন জেলায় জামা'আতে গেলেন। আসরের পর বাজারে গাশতে বের হলেন। তিনি ছিলেন জামা'আতের মুতাকাল্লিম। দাওয়াত নিয়ে এক পানদোকানীর কাছে গেলেন। বেচারা পানওয়ালা কোনও কারণে ক্ষেপে গেল। এসপি সাহেবকে বলল, বেশি কথা বললে কষে থাপ্পড় মেরে দেব। অবস্থাদৃষ্টে আমীর সাহেব জামা'আত ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন। বয়ানের পর এসপি সাহেব বললেন, ভাই! আমিও কিছু বলি। আজ পানওয়ালার কাছে আমার নফসের ইসলাহ হয়ে গেছে। পরিচয় দিতে পারিনি। পরিচয় দিলে হয়ত তার পেশাব হয়ে যেতো!

দাওয়াত দ্বারা কয়েকটি কাজ সহজ হয়

(১) নফসের ইসলাহ সহজ হয়। কেননা লোকে উল্টা-পাল্টা বললে তা বরদাশত করতে হয়।

(২) আরাম-আয়েশ থেকে বের হওয়া সহজ হয়। কেননা, দাওয়াতের কাজে কামাই-রোজগার কিছুটা ব্যাহত হয়। আর নফস চায় না কোনভাবেই কামাই-রোজগার ব্যাহত হোক। উপরন্তু দাওয়াতের কাজে মালের সাথে জানও খরচ করতে হয়।

দাঈকে চার হালতে থাকতে হয়।

১. কখনও দাওয়াতে।

২. কখনও তা'লীমের হালকায়।

৩. কখনও যিকির-আযকারে।

৪. রাতের বেলা দু'আয়।

ওদিকে মুজাহাদা আর এদিকে আমল ও দু'আ। এভাবে মেহনত করা হলে দাওয়াত দ্বারা হেদায়াত আসবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(অর্থ : আর যারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে উপনীত করব। (সূরা আনকাবূত-৬৯)

দাওয়াতে আসলে দীনের উপর আসা যাবে। দাওয়াতে না আসলে দীনের উপর আসা যাবে না। দাওয়াতের বরিয়ায় ভিতরে ভিতরে আল্লাহর ভয়, ইয়াকীন, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল বাড়বে। কেয়ামতের তৈয়ারির চিন্তা বাড়বে।

আমরা যারা বাচ্চাদেরকে কুরআন পড়াচ্ছি, তাদেরকে একথাও চিন্তা করতে হবে যে, কুরআন যাদেরকে মুখাতাব (সম্বোধন) করেছে তাদেরকে কেন ছেড়ে দিচ্ছি, তাদেরকে কুরআন শেখানোর জন্য কেন সময় দিচ্ছি না। আজ কৃষক ব্যস্ত, দোকানদার ব্যস্ত, অফিসার ব্যস্ত, মজদুর ব্যস্ত, হুকুমতওয়ালা ব্যস্ত। সবাই ব্যস্ত অথচ কুরআন তাদেরকেই সম্বোধন করছে –

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

অর্থ : হে মুমিনগণ! নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। (সূরা–তাহরীম-০৬)

এ আয়াতে তো বাচ্চাদেরকে সম্বোধন করা হয়নি। উল্লিখিত ব্যস্ত বয়স্কদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে নবীজীর এই নির্দেশও শুনুন–

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই (নিজ অধীনস্তদের) দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজের অধীনস্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সহীহুল বুখারী হা. নং ৮৯৩)

এবার বলুন! বাচ্চারা কি কারখানায় দীন চালু করতে পারবে? পারবে না। বরং বড়রা দীন শিখে কারখানায় গিয়ে চালু করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড়দেরকে শিখিয়ে বাচ্চাদেরকে তাদের অনুগামী করে দিতেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে মুতা'আল্লিম, মু'আল্লিম, মুবাল্লিগ ও মুজাহিদ এই চার গুণবিশিষ্ট করে গড়ে তোলেন। আমি আপনাদেরকে বাচ্চা পড়ানো ছাড়তে বলি না। শুধু একটি বাড়তি যিম্মাদারী যোগ করতে বলি। সেটা হল, আসর পর্যন্ত বাচ্চা পড়িয়ে সন্ধ্যায় ওদের অভিভাবকদেরকে দীনের দাওয়াত দিন। এতে উভয় সাওয়াব হবে। বড়দের শেখানোর সাওয়াব হবে, ছোটদের শেখানোর সাওয়াবও হবে। বড়দের মধ্যে দীন আসলে ছোটদেরও সাহস হবে। বলবে, আব্বা! বোনের বিয়ে শরীয়তমত দিবেন। আব্বা তখন মেনে নিবে। এজন্য ছাত্রের অভিভাবককে আল্লাহর রাস্তায় বের করে দাও, আল্লাহ তাদেরকে বদলে দিবেন। কারণ, সে 'ওয়াল্লাযীনা জাহাদূ'-তে লেগে গেছে। এভাবে দাওয়াত চললে হক উপরে উঠবে। নয়তো না-হক উপরে উঠে যাবে।

উলামায়ে কেরাম সরদার। দুনিয়ায় দুই ধরণের সরদার আছে। ১. বাদশাহ। এ হল দুনিয়ার সরদার। ২. উলামা। এঁরা হলেন দীনের সরদার। উলামায়ে কেরাম বাদশাহর উপরও গালেব হবেন দাওয়াত নিয়ে চললে। সাময়িকের জন্য নয়, হামেশার জন্য গালেব হবেন। ছোটদের উপর মেহনত করতে করতে বড়দের উপর মেহনত করুন, তাহলে ছোটরা কিছু আমার কাছে শিখবে, আর কিছু মা-বাপের কাছে শিখবে। আমি তো আলফায শেখাব, আর মা-বাপ শেখাবে যিন্দেগী ।

দাওয়াত পুরা ইসলামের বুনিয়াদ। দাওয়াত ঈমানের বুনিয়াদ। দাওয়াত ইলমের বুনিয়াদ। দাওয়াত নামাযের বুনিয়াদ। দাওয়াত যিকিরের বুনিয়াদ। দাওয়াত মু'আমালাতের বুনিয়াদ। দাওয়াত মু'আশারাতের বুনিয়াদ। দাওয়াত আখলাকের বুনিয়াদ।

সাহাবায়ে কেরাম দাওয়াতের রাস্তায় চলেন তো দীন আসে, হক গালেব হয়, বাতিল ভেঙ্গে পড়ে। পক্ষান্তরে আমরা শুধু দু'আর দ্বারা বাতিল ভাঙ্গতে চাই। বলতে পারেন, ইতিহাসে তো আছে, তাকবীর দ্বারা দেয়াল ভেঙ্গে গেছে!! হ্যাঁ, ভাঙ্গে, কিন্তু সেটা কি আমার তাকবীর দ্বারা? না, সেটা তো মুজাহিদের তাকবীর। মুজাহিদের তাকবীর প্রচণ্ড শক্তিশালী। আমার তাকবীর তো শ্রেফ আলফায ও শব্দ।

'আলফায আওর মা'আনী মেঁ ফারক নেহীঁ, মাগার মুজাহিদ কি তাকবীর মেঁ ফারক হ্যায় মুয়াযযিন কি তাকবীর সে।'

মুজাহিদের তাকবীর কাফেরের দিল কাঁপিয়ে দেয়...। আর মুআযযিনের তাকবীর দ্বারা অনেক সময় পাশের দোকানদারের দিলেও দাগ কাটে না।

ইমামের দায়িত্ব শুধু নামায পড়িয়ে দেয়া নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসল্লী কমলে খোঁজ নিতেন। কাজেই আমরাও মানুষের দীনের খবর নেই।

(৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা.-এর জরুরী ওয়াযাহাত

তাবলীগ সংকট নিয়ে চলমান বিতর্কে মাওলানা ফরীদুদ্দীন মাসঊদ সাহেব গত ৯ ডিসেম্বর এক বক্তব্যে দাবী করেন, পাকিস্তানের বিশিষ্ট গবেষক আলেম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা.বা. নিযামুদ্দীনের মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে প্রণীত দেওবন্দের ফতওয়াকে 'কোনো ফতওয়াই নয়' বলে উল্লেখ করেছেন। এর আগে মাওলানা ফরীদুদ্দীন মাসঊদ সাহেব ডিসেম্বরের শুরুতে দুবাইয়ে একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগ দিতে যান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমও। কনফারেন্সে মুফতী তাকী উসমানী দা.বা.-এর সঙ্গে দেখা হলে তিনি উল্লিখিত মন্তব্য করেন বলে মাওলানা ফরীদুদ্দীন মাসঊদ সাহেব দাবী করেন তার বক্তব্যে। এটা নিয়ে বাংলাদেশের তাবলীগ ও উলামা মহলে বিতর্ক সৃষ্টি হয় এবং মুফতী তাকী উসমানী দা.বা.-এর বক্তব্য বিষয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়। এই ধোঁয়াশা পরিষ্কার করতে মুফতী তাকী উসমানী দা.বা.-এর প্রিয় শাগরেদ, মুফতী মীযানুর রহমান সাঈদ সাহেব সম্প্রতি হোয়াটসঅ্যাপে একটি বার্তা পাঠান মুফতী তাকী উসমানীর কাছে। ফিরতি জবাবে মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. দেওবন্দের ফতওয়া বিষয়ে তাকে জড়িয়ে যেসব কথা বলা হয়েছে সেগুলোকে পুরোপুরি মিথ্যাচার বলে আখ্যায়িত করেছেন। নিচে মাওলানা তাকী উসমানী দা.বা. ও মুফতী মীযানুর রহমান সাঈদ সাহেবের পুরো অডিওক্লিপ ভাষান্তর করে পত্রস্থ করা হলো।

মুফতী মীযানুর রহমান সাঈদ সাহেবের টেলিফোন-বার্তা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া-রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ!

'আমি বাংলাদেশ থেকে মীযানুর রহমান সাঈদ বলছি। বিতর্কিত একটা বিষয়ে ভয়েস ম্যাসেজের মাধ্যমে আপনার সঙ্গে কথা বলছি। হযরত! বাংলাদেশী উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে বিষয়টা নিয়ে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি।

'বাংলাদেশের সোশ্যাল মিডিয়াতে মাওলানা ফরীদুদ্দীন মাসঊদ, যিনি বাংলাদেশেরই একজন আলেম, তিনি এ বছর ডিসেম্বরের শুরুতে দুবাই-আবুধাবী গিয়েছিলেন এবং সেখানে আপনার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

'দেশে ফেরার পর তিনি এক বক্তব্যে অনেক কথা বলেন। ওই বক্তব্যে একটা কথা এমন ছিল-'মাওলানা তাকী উসমানী সাহেবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। সেখানে কেউ একজন তাকে জিজ্ঞেস করেন, দারুল উলূম দেওবন্দ মাওলানা সাদ সাহেবের বিষয়ে যে ফতোয়া দিয়েছে সে বিষয়ে আপনার মতামত কী? মাওলানা তাকী উসমানী বলেন, দারুল উলূমের ওই ফতওয়া কোনো ফতওয়াই নয়। কেননা, সেটা ফতওয়ার কোনো উসূলের মধ্যেই পড়ে না।'

'এ কথা বলে আপনি দারুল উলূমের ফতওয়াকে অস্বীকার করে দিয়েছেন। তিনি তার বক্তব্যে এ কথা বলার পর এখানে (বাংলাদেশে) কিছু লোক আপনাকে দারুল উলূমের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মাওলানা সাদ সাহেবের ফতওয়ার বিরুদ্ধেও আপনাকে দাঁড় করিয়ে প্রচার করছে।'

'সুতরাং যদি এই ম্যাসেজের মাধ্যমে আপনার কোনো পরিষ্কার জবাব পাওয়া যেতো তাহলে উলামায়ে কেরাম ইতমিনান হাসিল করতেন। এ কারণেই আমি আপনাকে এই কষ্টটুকু দিচ্ছি। যদি সময় হয় তাহলে এর একটা উত্তর দিবেন আশা করি। জাযাকুমুল্লাহু খায়রান। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ!'

মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের উত্তর

'আমি তাকী উসমানী বলছি। এর আগেও আমি আপনাকে এ বিষয়ে ম্যাসেজ পাঠিয়েছি যে, আমি এমন কোনো কথা বলিনি। সঠিক কথা হলো, মাওলানা ফরীদুদ্দীন মাসঊদ সাহেবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা, সে ব্যাপারে আমার মনে পড়ছে না। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনেক মানুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, কথা হয়, সবাইকে আমি চিনিও না। হতে পারে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।'

'কেউ আমাকে এমন কিছু জিজ্ঞেস করেছে বলেও আমার মনে পড়ছে না যে, (তাবলীগ বিষয়ে) দেওবন্দের ফতওয়ার ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী? এ ব্যাপারে আমি না আগে কখনো বলেছি আর না এখনও বলছি যে, 'দেওবন্দের ফতওয়া কোনো ফতওয়াই নয়, এটা ফতওয়ার কোনো উসূলের মধ্যেই পড়ে না।'

'এ কথাকে যে ব্যক্তি আমার কথা বলে প্রচার করেছেন, তিনি সরাসরি অসত্য বলেছেন। আমি এমন কোনো কথাই বলিনি। আর আমার পক্ষে এমন কথা বলার সম্ভাবনাও নেই। এমন কথা আমি বলিনি, বলিও না।

'আপনি ইচ্ছা করলে আমার এই বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ'

[কারও প্রয়োজন হলে অডিওক্লিপটি **ইসলাম টাইমস ২৪ ডটকম**-এ সার্চ দিয়ে শুনতে পারবেন।]

আ ত্ম জী ব নী

*দারুল উলূম করাচির মুখপত্র মাসিক আল-বালাগ মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের ধারাবাহিক আত্মজীবনী 'ইয়াদেঁ' প্রকাশ করছে। মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের সম্মতিক্রমে রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার মুখপত্র দ্বি-মাসিক রাবেতা এখন থেকে ইয়াদেঁ-এর ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশ করবে। অনুবাদ করেছেন জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) থেকে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা সমাপনকারী, বর্তমানে দারুল উলূম করাচির ইফতা বিভাগে অধ্যয়নরত **মাওলানা উমর ফারুক ইবরাহীমী**।*

ইয়াদেঁ - یادیں

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

(পঞ্চম পর্ব - پانچویں قسط)

পাকিস্তানে হিজরত

সে সময় (পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে) আমাদের ঘরের প্রধান আলোচনা ছিল, এই নাযুক ও ভয়ানক পরিস্থিতিতে আমাদের পাকিস্তান হিজরত করা উচিত কিনা? হযরত আব্বাজান রহ. স্বীয় মুর্শিদ হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. এবং স্বীয় উস্তাদ শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী রহ.-এর ইঙ্গিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী রহ. তখন পাকিস্তান চলে গিয়েছিলেন। কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেব পাকিস্তানের সর্বপ্রথম পতাকা উত্তোলনের জন্য তাকেই অনুরোধ করেছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হযরত শাব্বির আহমাদ উসমানীর প্রথম চেষ্টা-সাধনা ছিলো, এদেশের জন্য ইসলামী সংবিধান প্রণয়ন করা হোক। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে তিনি মরহুম জিন্নাহ সাহেব এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান সাহেবকে ইসলামী সংবিধান প্রণয়নের জন্য তৎকালীন প্রথিতযশা উলামায়ে কেরামের সাহায্য নিতে উদ্বুদ্ধ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এই কাজের জন্য আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব, হযরত মাওলানা মানাজির আহসান গিলানী এবং জনাব ডাক্তার হামিদুল্লাহ সাহেব রহ.-কে নির্বাচন করা হয়েছিল এবং তাদেরকে পাকিস্তানে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল, তারা যেন তিন মাসের মধ্যে ইসলামী সংবিধানের খসড়া তৈরি করে তা রিপোর্ট আকারে পেশ করেন।

আব্বাজান মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.-এর জন্য স্থায়ীভাবে দেওবন্দ ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যাওয়া বিভিন্ন কারণে অত্যন্ত দুষ্কর ছিলো। প্রথমত দেওবন্দে আব্বাজানের নানাবিধ ব্যস্ততা ছিলো; মুহূর্তেই সেগুলো ছেড়ে আসা বিলকুল সহজ ছিলো না। দ্বিতীয়ত আমাদের দাদীজান রহ. আব্বাজানের সঙ্গেই থাকতেন। দাদীজানকে দেওবন্দে একা রেখে আসাটা ছিলো দুরূহ ব্যাপার। আবার সঙ্গে করে পাকিস্তান নিয়ে যাওয়াটাও ছিলো মুশকিল। কারণ, তখন তিনি ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধা। এদিকে নিরাপত্তা পরিস্থিতি ছিলো বড় খতরনাক। ওদিকে বিবাহিতা দুই কন্যাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া ছিলো প্রায়অসম্ভব ব্যাপার। সেকালে সন্তানাদি ভিনদেশে থাকার কল্পনা করাও বড় কষ্টের ছিলো। তৃতীয়ত দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে অবসর গ্রহণের পর, সাংসারিক প্রয়োজন মেটানোর একমাত্র মাধ্যম ছিলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান– কুতুবখানা দারুল ইশা'আত। তখনকার ঝঞ্ঝাট ও ফ্যাসাদপূর্ণ সময়ে সেটাকে পাকিস্তানে স্থানান্তর করা ছিলো বিরাট ব্যাপার। চতুর্থত সে সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে চলছিলো হিন্দু-শিখ কর্তৃক একতরফা মুসলিম গণহত্যা। পাকিস্তানে আগমনকারী মুহাজিরদের তখন কদমে কদমে খুনের দরিয়া পাড়ি দিতে হতো। পঞ্চমত পাকিস্তানে আমাদের ভরণ-পোষণের কোন স্থায়ী সমাধান ছিলো না। উল্লিখিত বিভিন্ন কারণে তখন পরিবারের সবার একটিই আলোচ্য বিষয় ছিলো যে, আমাদের পাকিস্তান যাওয়া মুনাসিব কিনা! হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হক থানবী রহ., যিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্বে দিল্লি সেক্রেটারিয়েট জামে মসজিদের খতীবের দায়িত্ব পালন করতেন, তিনি আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী রহ.-এর প্রায় কাছাকাছি সময়ে পাকিস্তান চলে গিয়েছিলেন। আল্লামা উসমানী রহ. তাকে হযরত আব্বাজান রহ.-কে আমন্ত্রণের জন্য দেওবন্দ পাঠালেন। এদিকে উল্লিখিত কারণে খান্দানের অধিকাংশের মতামত ছিলো ভিন্ন। কিন্তু অবশেষে আব্বাজান ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিলেন– যে পাকিস্তানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কাজে এতদিন যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তার সঠিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি-অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ কাজে সেখানে সশরীরে অংশগ্রহণ অপরিহার্য। আব্বাজানের জন্য এটি ছিলো অত্যন্ত কঠিন এক সিদ্ধান্ত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে অস্বাভাবিক হিম্মত ও মনোবল দান করেছিলেন। তাই তিনি সকল সমস্যা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ঘরের সবাইকে সোজাসাপ্টা হিজরতের কথা জানিয়ে দিলেন এবং প্রস্তুতি নিতে বললেন। বয়স-স্বল্পতার দরুন সমস্যাদির কথা তো আমার কিছুই জানা ছিলো না, তবে ঘরের সামগ্রিক পরিবেশে আনন্দ-বেদনার এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া ঠিকই আঁচ করতে পারতাম।

আব্বাজান রহ. জীবনের বেশির ভাগ সময় পৈতৃক ভিটেবাড়ির একটি ছোট্ট কুটিরে অতিবাহিত করেছেন। মাত্র বছর কয়েক আগে খুব শখ ও আগ্রহ করে নিজস্ব বাড়ির নির্মাণকাজ সম্পন্ন করিয়েছেন। বাগান করার প্রতিও তার খুব শখ ছিলো। এজন্য দেওবন্দের জি.টি. রোডের সন্নিকটে একটি বাগান করেছিলেন। ইলমী ব্যস্ততার ফাঁকে খানিক ফুরসত মিললেই তিনি বেশিরভাগ আসরের পর সেখানে চলে যেতেন। কখনও কখনও আমিও আব্বাজানের সঙ্গী হতাম। বাগানটিতে তিনি যত্ন করে বিশেষত আমের চারা লাগিয়েছিলেন। হিজরতের বছরই সেগুলোতে প্রথম ফল ধরেছিলো। বাগানে তিনি একটি কুঠরিও বানিয়েছিলেন। মাঝেমধ্যে পরিবারের সবাই জড়ো হয়ে বাগানের সবুজ-শ্যামলিমা উপভোগ করতাম। এসব শখের বস্তু মুহূর্তের মধ্যে চিরদিনের জন্য ছেড়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে ধৈর্যের বৃহৎ পরীক্ষা ছিলো। কারণ, ছেড়ে যাবার অর্থ

ছিলো এ সকল ঘর-বাড়ি, জমি-জিরেত সব সরকারী তহবিলে চলে যাওয়া। হযরত আব্বাজান রহ. এই স-ব কিছু ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে বলতেন–

‘যেদিন আমি ঐ বসতবাড়ি, বাগ-বাগিচা থেকে কদম উঠিয়েছি, এগুলো আমার দিল থেকেও বের হয়ে গেছে।’

বাস্তবতা হচ্ছে, ‘যুহদ’ তথা দুনিয়া-বিরাগ-এর যে ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন গ্রন্থে পড়েছি এবং বুযুর্গদের মুখে শুনেছি যে, ‘দুনিয়ার ধন-সম্পদের প্রতি মন বসানো যাবে না। যদি সম্পদ থাকে, তবে তার মোহকে হৃদয়ে স্থান দেয়া যাবে না।’ –একথার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ আমরা আব্বাজানের জীবনের পরতে পরতে প্রত্যক্ষ করেছি। আল্লাহ তা‘আলা তাকে আপন রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দিন। আমীন!

আব্বাজান মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আপাতত তার অবিবাহিত সন্তানরাই শুধু তার সঙ্গে পাকিস্তান যাবে। আর বিবাহিত সন্তানরা ফিলহাল দেওবন্দেই থাকতে থাকবে। (পথঘাট আরও কিছুটা নিরাপদ হলে তখন তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে।) এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের বড় দুই বিবাহিতা বোন এবং ভাইজান জনাব মুহাম্মদ যাকী কাইফী রহ.-কে দেওবন্দেই থেকে যেতে হবে। সুতরাং হিজরতের প্রস্তুতি সেভাবেই শুরু হলো।

দেখতে দেখতে হিজরতের পূর্বনির্ধারিত তারিখ ১৯৪৮ সালের ১লা মে চলে আসল। আজ রাতেই আমাদের দেওবন্দ ছেড়ে চলে যেতে হবে। মনে পড়ছে, সেদিন দুপুর থেকেই আমাদের বৈঠকখানায় আত্মীয়-স্বজনের ভীড় উপচে পড়ছিল। আমাদের বিদায় জানাবেন বলে আশপাশের অনেক মহিলা জড়ো হয়েছিলেন। আমাদের অবিবাহিতা দুই বোন– যারা আমাদের সফরসঙ্গী ছিলেন এবং যাদের ব্যাপারে পূর্বে বলে এসেছি যে, তারা কাব্যচর্চাও করতেন –বিদায়বেলায় তারা প্রিয় জন্মভূমিকে সম্বোধন করে কিছু মর্মস্পর্শী শ্লোক আবৃতি করেছিলেন। তন্মধ্যে এই শ্লোক দু’টো যেনো আজও আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হচ্ছে।

سلام تجھ پہ کہ اب دور جا رہے ہیں ہم.
لے آج آخری آنسوں بہا رہے ہیں ہم

সালাম তোমায় বিদায়বেলা, যাচ্ছি চলে দূরে,
নাও আখেরী অশ্রুফোঁটা দিলাম তোমার তরে।

আমার এই দু’বোন, বিদায় জানাতে আসা মহিলাদের শোকগাথা শোনাচ্ছিলেন আর সবার বিরহবিধুর চোখ অশ্রুতে ভরে উঠছিলো। সে রাতেই আমরা দেওবন্দ রেলস্টেশন থেকে রেলে চেপে বসলাম। আমাদের প্রথম যাত্রাবিরতি ছিল দিল্লিতে। সফরসূচী অনুযায়ী আমাদের এখানে এক দিন থাকার কথা ছিল। দিল্লি সেক্রেটারিয়েটের জনৈক অফিসার আব্বাজানকে রিসিভ করার জন্যে আগে থেকেই স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তার বাসাতেই আমাদের অবস্থানের বন্দোবস্ত হয়েছিল। তিনি আমাদের নেয়ার জন্যে কালো রঙের একটি ‘অস্টিন কার’ নিয়ে এসেছিলেন। যদ্দুর মনে পড়ে, এটাই ছিল আমার জীবনে প্রথম গাড়ি দেখা এবং গাড়িতে চড়া। সেই আনন্দঘন মুহূর্তের সুখানুভূতি আজও আমার হৃদয়ে গেঁথে আছে এবং গাড়ির ভেতরের সুবাস যেনো এখনো আমার নাকে লেগে আছে।

দিল্লির সেই একটি দিন কিভাবে কেটেছিলো, তা অবশ্য এখন মনে নেই; তবে এতটুকু মনে আছে, পরের দিন আমরা দিল্লি রেলস্টেশনের যে প্লাটফর্ম থেকে রেলে আরোহণ করেছিলাম সেটি প্রধান প্লাটফর্ম থেকে ভিন্ন ছিলো। কারণ, এটি রাজস্থানগামী ছোট্ট রেলের প্লাটফর্ম ছিলো। আমাদের বড় ভাইজানের ব্যাপারে যদিও এটিই সিদ্ধান্ত ছিলো যে, তিনি আপাতত পাকিস্তান যাবেন না, তা সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে এগিয়ে দেয়ার জন্য দিল্লি পর্যন্ত এসেছিলেন। ভাইজানের একা-একা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকার সেই চিত্র এবং আমাদের বহনকারী রেলটি ধীরেধীরে প্লাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে যাবার দৃশ্য আজও আমার স্মৃতিতে অমলিন হয়ে আছে। ওদিকে প্লাটফর্ম সংলগ্ন লালকেল্লার হৃৎপিণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকা মিনারটিও তখন আমার চোখের আড়াল হয়নি। পাকিস্তান আসার পরও যখন ভাইজানের কল্পনা করতাম, তখন প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা ভাইজান এবং তার পেছনে লালকেল্লার মনোমুগ্ধকর দৃশ্যটি আমার হৃদয়ের ক্যানভাসে ভেসে উঠতো।

পাঁচ বছরের একটি ছোট্ট শিশুর অন্তরে স্বদেশ ত্যাগ করা, একটি নতুন রাষ্ট্র গঠিত হওয়া এবং আজীবনের জন্য সেখানে হিজরত করার অন্তর্নিহিত বিষয়-আশয়ের কীইবা ধারণা থাকতে পারে!? স্বভাবতই আমি এসব পেরেশানী থেকে বে-খবর ছিলাম। শুধু এতটুকুই জানতাম যে, বাবা-মা, ভাই-বোনদের সাথে রেলের লম্বা সফর হবে। সুতরাং আমি ঝিকঝিক শব্দ তোলা রেলের জানালায় সেঁটে থাকতাম আর প্রতিটি নতুন স্টেশনের হৃদয়কাড়া দৃশ্য দেখে বিমোহিত হতাম। সে বয়সে আমার এটাও জানা ছিলো না যে, কোন স্টেশন ছেড়ে যাবার পূর্বমুহূর্তে রেলের ইঞ্জিন ধোঁয়া ছেড়ে তিনবার হুইসল বাজায় এবং তৃতীয়বারের পর রেল চলতে শুরু করে। আমার বড় দুইভাই যখন বাঁশির আওয়াজ শুনতো অথবা গার্ডের সবুজ ঝাণ্ডা দেখতো তখন আমাকে বলতো– ‘কি হে! রেল চালিয়ে দেবো?’ আমি মাথা দুলিয়ে হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলে তারা বগির কোন দেয়ালে হাত দিয়ে ধাক্কা দিতো, আর অমনিই রেল চলতে শুরু করতো। তাদের এই কীর্তিকলাপ দেখে আমি হয়রান হয়ে যেতাম যে, তারা এই বগিতে বসে পুরো রেলটাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে!? সে সফরের এ কথাও আমার মনে আছে যে, আমি জানালার পাশে বসে রুটি খাচ্ছিলাম আর রেলের স্টেশন ছাড়ার দৃশ্য দেখে পুলকিত হচ্ছিলাম। হঠাৎ একটি চিল এসে আমার হাত থেকে রুটির টুকরোটি ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো!

ইতোমধ্যে আমরা দিল্লি থেকে রাজস্থানের শহর যোধপুর পৌঁছে গেলাম। এখানে আমরা একরাত অবস্থান করেছিলাম। রাজস্থানের শুধু এতটুকু স্মৃতি আমার মনে আছে, যে ঘরে আমরা অবস্থান করেছিলাম সেটি রেললাইন সংলগ্ন ছিলো এবং ঘরের পাশ দিয়ে একটি দুর্গন্ধযুক্ত ময়লাবাহী গাড়ি যাচ্ছিলো। গাড়িটি সম্ভবত দূরে কোথাও ময়লা-আবর্জনা ফেলে আসার কাজে ব্যবহার হতো। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে আমরা বাড়মিল স্টেশন পৌছলাম। এখানে আমাদের দু’বোনের কাপড়-চোপড়ের পেটরাটি বমাল হারিয়ে গেলো। এটির খোঁজাখুঁজিতে যথেষ্ট পেরেশানী পোহাতে হলো। এই স্টেশন পেরিয়েই পাকিস্তান শুরু। পাকিস্তান প্রবেশের আগে কাস্টম হচ্ছিলো। হিন্দুস্তানী কাস্টমস অফিসার মুহাজিরদের আসবাবপত্র তল্লাশির ক্ষেত্রে ভীষণ কড়াকড়ি করছিল। বিশেষত সেলাইবিহীন বাড়তি কোন কাপড় নিতে দিচ্ছিল না। সম্ভবত তারা চাচ্ছিল–

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে তারা যে 'ভুখা-নাঙ্গা পাকিস্তান'-এর শ্লোগান তুলেছিল, তা নিজেরাই বাস্তবায়িত করে মুহাজিরদের দেখিয়ে দিবে যে, দেখো! তোমরা যে স্বাধীন রাষ্ট্র কামনা করেছো, সেখানে তোমাদের পরিধেয় বস্ত্রও জুটছে না! আমাদের আসবাবপত্রের মধ্যে একটি সেলাইমেশিন ছিলো, কাস্টমস অফিসার সেটিও বাজেয়াপ্ত করে নেয়। কাস্টমসের পীড়াদায়ক কর্মযজ্ঞ শেষে রেল রওয়ানা হলো। অল্পসময় পরই আমরা পাকিস্তানের সীমানায় প্রবেশ করলাম। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ছিলো হায়দারাবাদ, সিন্ধ। সেখানেও আমরা একরাত অবস্থান করি। এখানকার এই স্মৃতিটুকুই আমার মনে আছে যে, সেখানকার প্রায় সব বাড়ির ছাদে তিনকোণা চিমনী দেখা যেতো, যা আমাদের মতো উত্তর প্রদেশের অধিবাসীদের জন্য ছিল বিস্ময়ের বস্তু।

হায়দারাবাদ থেকে রওয়ানা হয়ে অবশেষে ৬ই মে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে আমরা করাচী সিটি রেলস্টেশন পৌঁছি। এখানে হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হক থানবী এবং আব্বাজানের পরম বন্ধু খলীফা মুহাম্মদ আকেল সাহেব রহ. আমাদেরকে স্বাগত জানাতে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন। যেহেতু আব্বাজান রাষ্ট্রীয়ভাবে আমন্ত্রিত ছিলেন তাই সরকার তাঁকে সদর এলাকায় (করাচির অভিজাত শহর) ভিক্টোরিয়া রোডস্থ একটি বিল্ডিং 'কিংস কোর্ট'-এর চতুর্থ তলার একটি ফ্ল্যাটে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। এখানে প্রথমদিকে সবাই আমরা ঘরের মেঝেতে ঘুমাতাম। বেশ কিছুদিন পর আমাদের জন্য খাটের ব্যবস্থা হয়েছিলো।

কিংস কোর্টের এই ফ্ল্যাটটি ছিলো সুন্দর ও ছিমছাম। ফ্ল্যাটের জানালাগুলো ভিক্টোরিয়া রোডের দিকে খুলতো। ভিক্টোরিয়া রোডের বর্তমান নাম আব্দুল্লাহ হারুন রোড। আজ সেখানে যান-বাহনের আধিক্য ও দু'পাশের সারিসারি দোকান-পাটের কারণে যে কর্মব্যস্ততা ও প্রাণচাঞ্চল্য চোখে পড়ে, তা দেখে ১৯৪৮ সালের সেই 'ভিক্টোরিয়া রোডে'র কল্পনা করা মুশকিল।

পরিচ্ছন্ন ও কোলাহলমুক্ত পরিবেশের কারণে এটি ছিলো শহরের সবচেয়ে অভিজাত সড়ক। এর ডানদিকে ছিলো করাচী শহরের কেন্দ্রীয় প্রধানসড়ক 'বন্দর রোড'। এ সড়কটিকে বর্তমানে 'কায়দে আজম রোড' বলা হয়। এখানেই ছিলো প্রধান ট্রাম (ছোট বগিবিশিষ্ট রেলগাড়ি) স্টেশন, যাকে বলা হতো 'ট্রাম গোদি'। বাঁ দিকে ছিলো সদরে'র ব্যস্ততম বাজার। সে যুগে করাচির প্রধান সড়কগুলো নিয়মিত ধুয়ে পরিষ্কার রাখা হতো। দেওবন্দের গ্রামীণ পরিবেশ থেকে উঠে আসা আমাদের জন্য এখানে চিত্তাকর্ষক অনেক কিছুই ছিল। এই সড়ক দিয়েই তৎকালীন পাক-গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রীসহ অতিথি রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়মিত যাতায়াত ছিলো।

'কিংস কোর্ট' নামক সেই ভবনটি আজও এই নামে বিদ্যমান। ভবনটি ছিলো পাঁচতলা বিশিষ্ট। বাসিন্দাদের দিকে লক্ষ করে এটিকে আসলে Multicultural 'বহুজাতিক নিবাস' বলা সমীচীন ছিল। আগেই বলেছি, আমরা থাকতাম চতুর্থ তলায়। পঞ্চম তলায় 'সিন্ধ' অঞ্চলের একজন প্রথিতযশা শিল্পপতি জনাব মরহুম মুহাম্মদ লায়েক লাখু সাহেব থাকতেন। 'লাখু' সিন্ধের একটি অভিজাত জনগোষ্ঠীর পদবী। সেকালে আশপাশের সবাই তাকে 'লাখা সাহেব' বলতো। আমার শিশুমনে লাখা'র মানে ছিল– 'তিনি একজন লাখপতি ব্যক্তি, তাই সবাই তাকে লাখা বলে।' তাদের সঙ্গে বলা যায়, আমাদের একরকম পারিবারিক বন্ধনই ছিলো। লাখু সাহেবের স্ত্রী আমাদের সব ভাইদের অত্যন্ত মহব্বত করতেন এবং আমাদের সঙ্গে বড়বোন-সুলভ আচরণ করতেন। তার পুত্র জনাব মরহুম গোলাম বশীর সাহেব আমাদের সহোদর ভাইয়ের মত ছিলেন। আমার বয়স তখন আনুমানিক পাঁচ বছর ছিলো। তাই আমি তাদের ঘরে নিঃসংকোচে চলে যেতাম। লাখু সাহেবের স্ত্রী সিন্ধী নিয়মে একটি সমতল তাওয়ায় ঘিয়েভাজা রুটি বানাতেন। সেটি আমার অনেক প্রিয় ছিলো। তিনিও খুব আদর-যত্ন করে আমাকে খাওয়াতেন। তার ঘরে সিন্ধী দোলনাও ছিলো। আমরা সেটিতে দোল খেয়ে আনন্দ উপভোগ করতাম। বাসার উপর খোলা ছাদ ছিলো। আসরের পর সেটাই আমাদের কচি-কাঁচাদের খেলার মাঠ হতো। গোলাম বশীর সাহেব তখন অল্পবয়সী ছিলেন। তিনিও নিঃসংকোচে আমাদের ঘরে আসতেন। লাখু সাহেবের ঘরের মহিলাদের সঙ্গে আমাদের ঘরের মহিলাদেরও মায়াময় সম্পর্ক ছিলো। মোটকথা, যতদিন আমরা সেখানে ছিলাম, দুঃখে-সুখে একে অন্যের ভাগিদার ছিলাম। দেখে মনে হতো, যেন আমরা একই পরিবারের আপনজন। পরবর্তীতে আমরা সেখান থেকে চলে আসলেও আমাদের সম্পর্কে কিছুমাত্র ভাটা পড়েনি। লাখু সাহেব ও তার পুত্র গোলাম বশীর সাহেবের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। গোলাম বশীর সাহেবের পুত্র গোলাম হাদী সাহেব, যিনি বর্তমানে এস্টেট এজেন্সির কাজ করেন, তার সঙ্গে আমাদের এখনো যোগাযোগ হয়।

আমাদের নিচে অর্থাৎ তৃতীয় তলায় থাকতেন জনাব উজির গুল সাহেব। তিনি ছিলেন নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার। তার বাড়ি ছিলো সীমান্ত প্রদেশে, যা বর্তমানে খাইবার পাখতুনখাঁ নামে পরিচিত। তাদের সঙ্গে এতোটাই হৃদ্যতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো যে, তার স্ত্রী আমার আম্মাজানকে মা বলে ডাকতেন। তার পুত্র শাহজাহান ও তার বোনেরা নিয়মিত আমাদের বাসায় আসা-যাওয়া করতো। উজির গুল সাহেবের স্ত্রীর যে কোন সমস্যা দেখা দিলে আমার আম্মাজানের কাছে পরামর্শের জন্য আসতেন।

চতুর্থ তলায় আমাদের ফ্ল্যাটের সামনে আরেকটি ফ্ল্যাট ছিল। এটিতে একটি ময়মন-পার্সি পরিবার থাকতো। তাদের ঘরের দরজায় পাউডার দিয়ে অঙ্কিত কারুকার্য দেখা যেতো, যা সে সময়ে পার্সিদের ঘরের নিদর্শন ছিলো।

দ্বিতীয় তলায় সাহারানপুর থেকে আগত একজন মুহাজির সরকারী অফিসার থাকতেন। নিচতলায় একটি মধ্যবয়সী ইংরেজ দম্পতির বসবাস ছিলো। ইংরেজ পুরুষটির একটি হাত ছিলো অচল। তাদের ঘরের সামনে একটি ছাদখোলা পুরনো গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতো। গাড়িটি তার মালিককে যা-না সেবা দিতো, তারচেয়ে বেশি মালিক থেকে উসূল করতো! দেখা যেতো, তারা সন্ধ্যায় কোথাও বেরোবার ইচ্ছে করলে সেই দুপুর থেকেই যন্ত্র-পাতি হাতে কখনো বনেটের সামনে দণ্ডায়মান, কখনো গাড়ির নিচে শায়িত। তারপর কালি-ধূলি সাফ করে ইংরেজ দম্পতি সন্ধ্যায় গাড়িতে চড়ে বসতো। স্টার্টের আওয়াজ শুনে আমরা বুঝে নিতাম, 'গা-গোসল' সেরে 'গাড়ি সাহেব' এখন সেবা দিতে প্রস্তুত!

এককথায় আমাদের এই পাঁচতলা ভবনটি বিচিত্র সংস্কৃতির মিলনমেলা ছিলো। হযরত আব্বাজান মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. যথাযোগ্য উপায়ে সকল প্রতিবেশির হক আদায়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। আমাদের শিশুমনে তখনো খেলাধূলা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি। তাই আমরা এসব কিছুর বৈচিত্রময় স্বাদ খুব করে উপভোগ করতাম। সংস্কৃতি ও কালচারে বিস্তর ফারাক থাকলেও আমাদের পরিবারগুলোর মাঝে ভাতৃত্বের এমন একটি বন্ধন ছিলো যে, সবাই পরস্পরের দুঃখ-সুখের ভাগিদার হতাম।

মনে পড়ে, একবার ওখানকার একটি তুলার গুদামে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড ঘটল। জায়গাটি ছিলো আমাদের বাসা থেকে অন্তত তিন-চার মাইল দূরে। কিন্তু আগুনের ভয়াবহ ধোঁয়া দেখে মনে হচ্ছিলো, যেনো তা আমাদের সামনের বাসাটিরই পেছনে। ধোঁয়া দেখামাত্রই আমাদের বিল্ডিংয়ের পুরুষ লোকেরা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে দ্রুত ছুটে গেলো। আমাদের বড় ভাই জনাব মুহাম্মদ রাযী সাহেব রহ.-ও তাদের মধ্যে ছিলেন। আমি আমাদের জানালা দিয়ে দেখলাম, নিকটস্থ প্রতিটি বিল্ডিং থেকেই বহুলোক সেই অগ্নিকাণ্ডের দিকে ছুটে যাচ্ছে। কয়েকঘন্টা পর ভাইজান ফিরে এসে বললেন, অগ্নিকাণ্ডটি এখান থেকে অনেক দূরে সিটি স্টেশনের তুলার গুদামে সংঘটিত হয়েছে এবং সবাই সেখানে গিয়ে আগুন নেভাতে সহায়তা করেছে। এই সহায়তা কাজে তুলার একটা জ্বলন্ত গাঁট ভাইজানের পায়ে এসে পড়েছিলো। এর ফলে বেশ কিছুদিন তার পায়ে যখম ছিলো। সেকালের মানুষের মাঝে ভালোবাসা ও মানবতার এমন আবেগঘন ও চিত্তাকর্ষক দৃশ্য হরহামেশাই দেখা যেতো, যেগুলো দেখার জন্য আজ চোখ দু'টো অধীর চেয়ে থাকে!

কিন্তু এই দিনগুলো আমাদের পিতা-মাতার জন্য ধৈর্যের বড় পরীক্ষা ছিলো। হিজরতের পর তিনমাস পর্যন্ত হযরত আব্বাজান রহ., হযরত মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী ও ডাক্তার হামিদুল্লাহ সাহেব প্রমুখ পাকিস্তানের সংবিধান সম্পর্কিত সুপারিশের রিপোর্ট তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তাই সেখান থেকে কিছু সম্মানী আসতো। কিন্তু এরপর আব্বাজানের ভিন্ন কোন আয়-উপার্জনের ব্যবস্থা ছিলো না। আমরা চার ভাই, যারা তার সঙ্গে এসেছিলাম, সবাই ছিলাম অল্পবয়সী। এ সময় আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিলো শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাপনা। উপরন্তু আমাদেরকে উল্লেখযোগ্য উপার্জনের কাজে লাগানোও সম্ভবপর ছিলো না। দেওবন্দ থেকে চলে আসার সময় যে যৎসামন্য নগদ অর্থ হাতে ছিলো, এই দীর্ঘ ও অনিরাপদ সফরে সেগুলো সাথে রাখা সমীচীন মনে হয়নি। তাই সে অর্থ দিয়ে আব্বাজান রহ. দেওবন্দের এক স্বর্ণকারের কাছ থেকে একটি স্বর্ণের হার বানিয়ে আম্মাজান রহ.-কে পরিয়ে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, পরে প্রয়োজনের সময় এটা বিক্রি করে নগদ অর্থের ব্যবস্থা করা যাবে। সুতরাং যখন আয়-রোজগারের কোন উপায় হচ্ছিল না তখন আব্বাজান সেই হারটি বিক্রির উদ্দেশ্যে করাচির এক স্বর্ণকারের কাছে নিয়ে গেলেন। স্বর্ণকার এটিকে নিরীক্ষা করে জানালেন, এটিতে স্বর্ণের লেশমাত্রও নেই! যে স্বর্ণকারের কাছ থেকে এটি বানানো হয়েছিলো সম্ভবত সে-ই পিতলের উপর স্বর্ণের প্রলেপ লাগিয়ে স্বর্ণের হার বলে বিক্রি করেছিলো। আপৎকালীন প্রয়োজন মেটানোর যে যৎসামান্য পুঁজি ছিলো তা-ও এভাবে মাটি হয়ে গেলো! তবে আমার মনে আছে, হযরত আব্বাজান রহ. কাউকে হেসে-হেসেই এ ঘটনার বর্ণনা দিতেন।

পাকিস্তান হিজরতের পর প্রধানমন্ত্রী থেকে নিয়ে নিম্নশ্রেণীর অফিসার পর্যন্ত বহু লোকের সঙ্গে হযরত আব্বাজানের সম্পর্ক ছিলো। তাঁরা কখনও কখনও আব্বাজানের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমাদের ঘরেও আসতেন। কিন্তু কেউ জানতো না, এই ঘরে তখন কী কঠিন অভাব-অনটন চলছে! স্বয়ং আমরা বাচ্চারাও জানতাম না, আব্বাজান কী নিদারুণ আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছেন! আম্মাজান রহ. লাগাতার কয়েকদিন শুধু ডাল রান্না করতেন। আমার তো এসবের কথা স্মরণ নেই, তবে আমার বড়ভাই হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ রফী উসমানী মাদ্দাযিল্লুহু –যিনি তখন দশবছর বয়সী ছিলেন– বলেন, একদিন আমি আম্মাজানকে অনুযোগ করে বললাম, 'আপনি নিত্যদিন শুধু ডালই রান্না করেন!' সেদিনই আম্মাজান প্রথমবারের মতো ভাইজানকে বলেছিলেন– 'তোমাদের কি কিছু জানা আছে যে, তোমাদের পিতার আয়-উপার্জনের কোনও ব্যবস্থা নেই!'

হযরত আব্বাজান রহ.-এর একবন্ধু হযরত খলীফা মুহাম্মদ আকেল সাহেব রহ. আমাদের দাদা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসীন সাহেব রহ.-এর শাগরেদ ছিলেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের ফার্সী ও গণিতের শিক্ষক ছিলেন। পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের ফলে তিনিও দেওবন্দ থেকে ইস্তফা দিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী রহ.-এর পাকিস্তান আসার পর তিনি আমাদের পূর্বেই পাকিস্তান চলে এসেছিলেন। এখানে এসে তিনি একটি মুদি দোকান খুলেছিলেন, যা সদর ও জ্যাকব লাইনের মাঝামাঝি অবস্থানে ছিলো। সেই প্রাথমিক সময়টায় যখন আব্বাজানের আয়-উপার্জনের কোনও ব্যবস্থা ছিলো না, তখন খলীফা মুহাম্মদ আকেল সাহেব তার দোকান থেকে কিছু খাদ্য-সামগ্রী যবরদস্তি আমাদের ঘরে পাঠিয়ে দিতেন। পরবর্তীতে জানতে পেরেছি, তার পাঠানো খাদ্য-সামগ্রী দিয়েই কিছুদিন পর্যন্ত আমাদের ঘরে খাবার রান্না হতো। একদিকে হযরত খলীফা মুহাম্মদ আকেল সাহেবের হৃদয়-নিংড়ানো ভালোবাসা এমনই ছিলো যে, তিনি কোন হিসাব-কিতাব রাখা ছাড়াই আমাদের ঘরে খাদ্য-সামগ্রী পাঠিয়ে দিতেন। অপরদিকে আব্বাজান রহ.-ও এই লেনদেনের ব্যাপারে এতোটা স্বচ্ছতা বজায় রাখতেন যে, যতবার তাঁর দোকান থেকে বিভিন্ন সামগ্রী আমাদের ঘরে আসতো তিনি তার পাই-পাই হিসেব রাখতেন। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা আব্বাজানকে আর্থিক সঙ্গতি দান করেছেন, তিনি যথাযথ হিসেব করে সে পরিমাণ অর্থ হযরত খলীফা সাহেব রহ.-এর খেদমতে হাদিয়া হিসেবে পেশ করেছেন। (পরবর্তীতে ঘটনাক্রমে একবার স্বয়ং খলীফা সাহেব আর্থিক অনটনের শিকার হয়েছিলেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে আব্বাজান রহ. তখন বেশ সচ্ছল ছিলেন। হযরত খলীফা সাহেব রহ.-এর সেই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আব্বাজান রহ. তাঁর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।)

চলবে ইনশাআল্লাহ...

প্র ত্য ক্ষ দ র্শী র বি ব র ণ

রক্তাক্ত টঙ্গীর ময়দান : ইতিহাসের কালো অধ্যায়

এ কেমন নৃশংসতা!

মুফতী আবূ আহনাফ আব্দুল্লাহ

ইজতেমার প্রস্তুতি কাজে অনেক আগে থেকেই ময়দানে যেতাম। ছাত্র-উস্তাদ সকলেই যেতেন। ময়দানের এ খেদমতটা স্বতঃস্ফূর্ত হওয়ায় 'যাওয়া-আসা-কাজ' পুরো ব্যাপারটাই উৎসবমুখর হতো। ফজর পড়েই সকাল সকাল ময়দানে যাওয়া, কাজে নেমে রীতিমতো প্রতিযোগিতায় লেগে যাওয়া, কাজ শেষে চোঁ-চোঁ পেটে হাপুস-হুপুস খাবার খাওয়া, গাড়ি আসতে বিলম্ব হলে দলবেঁধে কেনাকাটা করা– সব মিলিয়ে দিনটা যে কী আনন্দে কেটে যেতো বুঝতেই পারতাম না। দিনটিকে একপ্রকার ঈদ-ঈদ মনে হতো। এই দিনটির জন্য আমরা আলাদা করে প্রতীক্ষায় থাকতাম। আর কাজে শরীক হতে পারাকে তো মহা-সৌভাগ্যের মনে করতাম। উস্তাদ হয়েছি আজ আট বছর। বিভিন্ন রকম দায়িত্ব ও ব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রায় প্রতি বছরই কাজে শরীক হয়েছি। এ বছরও ইজতেমার প্রস্তুতিমূলক কাজের সুবাদে ১লা ডিসেম্বর'১৮, শনিবার ময়দানে ছিলাম। আগের দিন জুমু'আর দায়িত্ব পালন করে মসজিদ থেকেই সরাসরি ময়দানে চলে গিয়েছি। ময়দানে তখন উলামায়ে কেরামকে মুহাব্বত করেন, আলেম-উলামার পরামর্শে চলেন এমন সাথীরা ছিলেন। ময়দানে রীতিমত মশওয়ারা, তালীম, বয়ান, আমল সবকিছুই ইহতিমামের সাথে চলছিল। হালতের কারণে জোরদার পাহারাদারীও ছিলো। মুরুব্বীগণের পরামর্শে মাদরাসার তালেবে ইলম, আলেম-উলামাদের মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াত, সূরা ইয়াসীন ও দু'আরও বিশেষ ইহতেমাম চলছিলো। আমি মুরুব্বীদের বলতে শুনেছি, 'মাদরাসার উলামা-ত্বলাবার মাধ্যমে ময়দানের কাজ সম্পন্ন করার মাকসাদ আমাদের কখনোই ছিলো না বা থাকে না বরং তাদের পবিত্রতম ও বরকতময় যবান, কদম ও হাত যখন ময়দানের কাজে ব্যবহার হয় তখন আমাদের কাজে এতোটাই তারাক্কী ও গতি আসে যা বলে শেষ করার নয়। খোদ টঙ্গীর ময়দানে অবস্থিত আমাদের কাকরাইল কর্তৃক পরিচালিত কওমী মাদরাসাটাও এসব লক্ষ্যকে সামনে রেখে কায়েম করা হয়েছে।'

এ কারণে বাংলাদেশে ইজতেমার সেই সূচনালগ্ন থেকে কওমী মাদারাসার উলামা-তলাবা বেশী থেকে বেশী ময়দানে শরীক হয়ে আসছেন। এবারই প্রথম ছাত্ররা কাজ করতে গিয়েছে বিষয়টি কখনই এমন নয়। আমার তো মনে হয়, আজকে যারা বড়, সমাজের সর্বদিকের দীনী জরুরত পুরা করছেন, হক্কানী এমন একজন আলেমও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা ছাত্র যামানায় ইজতেমার কাজে শরীক হননি; বরং তারা প্রত্যেকেই ময়দানের আমলে শরীক হওয়াকে নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করতেন এবং এখনো করেন।

শুক্রবার দিবাগত রাতটি আমি ময়দানে কাটিয়েছি। দেখেছি, গভীর রাতে সাথী ও ছাত্রভাইয়েরা তাহাজ্জুদ পড়ে কতোটা রোনাজারী ও হাউমাউ করে আল্লাহর দরবারে চোখের পানি ঝরিয়েছে। মকবূল মেহনতটি যেন কারো স্বার্থের জন্য শেষ না হয়ে যায় এজন্য তারা অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন! প্রত্যেকেই ময়দানে যতক্ষণ ছিলেন, কোন না কোন আমলে ফজর পর্যন্ত গভীরভাবে মগ্ন ছিলেন।

শনিবার, বাদ ফজর। পুরো ময়দানে হূলস্থুল কাণ্ড। কে বা কারা সংবাদ রটিয়ে দিল, সারাদেশের এতায়াতিরা একযোগে ময়দানে প্রবেশ করবে; সুতরাং যে যা পাও, তা নিয়েই প্রতিরোধ গড়ে তোলো। আর যাদের হোন্ডা আছে তারা ময়দানের বাইরে গিয়ে পাহারাদারী জোরদার করো। সংবাদটা আমার মতো অনেকের কাছেই সন্দেহজনক মনে হয়েছিলো। কারণ, আমাদের মুরুব্বীদের দিকনির্দেশনা ছিলো– 'দুনিয়াতে আসবাব ইখতিয়ার করতে হয় তাই আমরা শুধু সুন্নাত পালনার্থে পাহারার আমল করছি, ময়দান তো আল্লাহ তা'আলা হেফাযত করবেন।' পরে দেখা গেলো, সত্যিই গোপনে একদল মুনাফেক ময়দানে ঢুকে হাঙ্গামার জন্য এসব গুজব ছড়াচ্ছিলো। আল্লাহর মেহেরবানী আমরা গুজবে প্রভাবিত হইনি। প্রত্যেকেই নিজেদের মামুলাত আদায় করছিলাম। অবশ্য কিছুক্ষণ পরই সাথীরা দু'জন এতায়াতিকে ধরতেও পেরেছিল। তবে তাদেরকে কোন কিছুই বলা হয়নি। মশওয়ারার কামরায় সম্মানজনকভাবে বসিয়ে রাখা হয়েছিলো। তবে এতায়াতিরা ময়দান দখলের পর সেই দুই ব্যক্তি আমাদের সাথে কতোটা হিংস্র আচরণ করেছিল সেটা বলার মতো নয়।

সকাল দশটা। মুহাম্মদপুরের সাথীগণ ও উলামা-ত্বলাবা ময়দানের উত্তর দিকের গেটগুলোতে সতর্কভাবে পাহারার আমল করছিলো। আমার ছাত্র ও মহল্লার সাথীদের নিয়ে আমি বিদেশী কামরার পার্শ্ববর্তী একটি গেটে পাহারায় ছিলাম। হামলার শেষ পর্যন্ত আমরা সেখানেই ছিলাম।

এতায়াতিরা শনিবার ফজর থেকেই ময়দানের চারপাশের রাস্তাগুলোতে মজবুত অবস্থান নিয়েছিলো। প্রতিটি গেটের সামনে জটলা করে হ্যান্ডমাইক ব্যবহার করে বাহ্যত বিভিন্ন বয়ান ও তালীম করছিলো। আসলে তখন ওরা প্রত্যেককে হামলা 'দায়িত্ব' বুঝিয়ে দিচ্ছিল এবং তালীমের ফাঁকে ফাঁকে ভেতরে অবস্থানরত উলামা-ত্বলাবাদেরকে অশ্রাব্য ভাষায় এমনসব গালাগালি করছিলো যা ভাষায় ব্যক্ত করার মতো নয়। আমি নিজ কানে শুনেছি, আমাদেরকে লক্ষ্য করে ওরা হ্যান্ডমাইকে চিৎকার করে বলছিলো, 'ছাত্ররা তোমরা ময়দান থেকে বেরিয়ে যাও। উস্তাদরা তোমাদেরকে ভুল বুঝিয়ে নিয়ে এসেছে। তোমাদের উস্তাদরা মুনাফিক। ইহুদীদের এজেন্ট। ইসলামের দুশমনী করার জন্য তারা তোমাদের এখানে এনেছে। তাদের কথা তোমরা শুনবে না। আমরাই তো তাদের বেতন দেই। আমাদের বেতন খেয়ে খেয়ে এসব আলেম-উলামাদের তেল বেড়ে গেছে... (নাঊযুবিল্লাহ)। এমন সব অবাস্তব, বাজে ও বেয়াদবীমূলক কথা বলে বলে ওরা আমাদেরকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছিলো এবং ক্রমাগত করেই যাচ্ছিল। রক্তে-মাংসে গড়া কোন মানুষের পক্ষে এসব বরদাশত করা প্রায় অসম্ভব ছিল। আমারও সহ্যের সীমা

ছাড়িয়ে যাচ্ছিলো। আমি মুরুব্বীদের কামরায় এসে পরামর্শ দিলাম, হযরত! ওদের লাগামহীন হুমকি-ধামকি আর গালিগালাজ তো আমরা বরদাশত করতে পারছি না। ময়দানের ভেতরে তো ওদের হ্যান্ড মাইকের তুলনায় শক্তিশালী বহু মাইক রয়েছে, প্রতিটি গেটে যদি সেগুলো লাগিয়ে জোর আওয়াজে বয়ান করা হয় এবং কুরআন-হাদীসের ক্ষেত্রে মাওলানা সাদ সাহেবের ভুল ও অপব্যাখাগুলোর প্রকৃতরূপ তুলে ধরা হয় তাহলে গ্রাম-গঞ্জের যেসব সাধারণ মানুষকে এতায়াতিরা থেকে মিথ্যা বলে, ভুল বুঝিয়ে নিয়ে এসেছে তারা সঠিক পথে ফিরে আসতে পারে। আমার কথা শুনে মুরুব্বীরা বললেন, সকল গেটে তালীম মজবুত করুন এবং প্রতিটি সাথীর তালীমে বসা নিশ্চিত করুন। ওদের মোকাবেলায় আমরাও যদি মাইক ব্যবহার করে কিছু বলতে থাকি তাহলে ওরা উত্তেজিত হয়ে উঠবে। হাঙ্গামা শুরু করে দিবে। এতে খায়ের না-ও হতে পারে।

আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি, তারপর একেবারে শেষ প্রর্যন্ত প্রতিটি গেটে তালীম নিশ্চিত হয়েছিলো। গেটের সামনে আমাদের সাথীরা বসে বসে তালীম করছিলো আর বিভিন্ন দু'আ-দুরূদ পড়ছিলো। যারা মিডিয়ার সাথে সম্পৃক্ত তারা অবশ্যই দেখে থাকবেন, এতায়াতিরা যখন বাটা গেটে হামলা করেছিলো ভিতরে তখনও আমাদের সাথীরা পশ্চিমমুখী হয়ে তালীম করছিলো। তারপর এতায়াতিরা আমলরত এসব আলেম-উলামা, মাদরাসার ছাত্র ও সাধারণ সাথীদের উপর যে নৃশংস হামলা চালিয়েছে তা তাবলীগের নাম ব্যবহারকারী কারও দ্বারা কখনও হতে পারে, কেউ কল্পনাও করেনি।

ওরা ভেতরে যাকে যেখানে পেয়েছে সেখানেই পিটিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছে। ময়দানের মাল-সামানার গোডাউনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সামনে যা কিছু পেয়েছে সবকিছুই তছনছ করে দিয়েছে। শত শত হোন্ডা, প্রাইভেটকার, সাথীদের মাল সামানা, প্লেট, বাটি, বালতি, চুলা এমনকি মশওয়ারার কামরা কিছুই ওদের তাণ্ডব থেকে রেহাই পায়নি। যা কিছু ধ্বংস থেকে রেহাই পেয়েছে সেগুলোর ভালো অংশও 'গনীমতের মাল' ফাতাওয়া দিয়ে হালাল করে ফেলেছে।

দীনের লেবাসধারী কোন মানুষ এতোটা নীচে নামতে পারে, এতোটা নৃশংস ও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে, এতায়াতিদের সেদিনকার তাণ্ডব স্বচক্ষে না দেখলে এর ধারণাও করতে পারতাম না। আক্রমণের হিংস্রতা দেখে সাথীরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলো। কী করবে বুঝেই উঠতে পারছিলো না। আমরা তুলনামূলক বড়রাও ওদের তাণ্ডব দেখে ভড়কে গিয়েছিলাম। কতোটা নির্দয় ও পাষাণ হলে এসব নিরীহ ছাত্র, হাফেযে কুরআন, আলেম-উলামা, মুরুব্বী সাথীদের উপর এমন নির্বিচারে খুন-খারাবি শুরু করতে পারে? আক্রমণের তীব্রতায় কেউ কেউ হাউমাউ করে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিলো। যারা ঘুমিয়ে ছিলো, যারা নামাযে দাঁড়িয়ে ছিলো যাকে যে অবস্থায় পেয়েছে তাকে সেখানেই পিটিয়ে রক্তাক্ত করে ছেড়েছে। হাতে-পায়ে ধরে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েও নিস্পাপ হাফেয ও তরুণ আলেমরা ওদের হিংস্রতা থেকে রেহাই পায়নি। বয়োবৃদ্ধ পুরনো তাবলীগী সাথীরা কাকুতি-মিনতি করেও নিজের দুর্বল শরীরটিকে রক্ষা করতে পারেনি। এককেটি শরীর আঘাতে আঘাতে যতক্ষণ না নিথর হয়েছে কিংবা ওরা মনে করেছে মরে গিয়েছে ততক্ষণ ওরা থামেনি। খোঁজে খোঁজে আলেমদেরকে বিশেষ টার্গেট করে হামলা করেছে। কোন একজন আলেমকে পেয়েছে তো এমন উল্লাস করে পিটিয়েছে মনে হয়েছে শুক্রুপক্ষের কাফের কোন সেনাপতিকে বাগে পেয়েছে। নাবালেগ তালেবে ইলমদেরকেও ওরা রেহাই দেয়নি। ময়দানের ভিতর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় গিয়ে কুরআন পড়া অবস্থায় সেখানের নিস্পাপ শিশুদেরকে মাথায় তুলে তুলে আছড়ে দিয়েছে। ফুটবলের মতো লাথি মেরে মেরে নিজেদের ক্ষোভ মিটিয়েছে। বাঁচার জন্য যারা বাথরুমে লুকিয়ে ছিলো তাদেরকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেখান থেকে বের করে দলবদ্ধভাবে পিটিয়েছে। কাউকে কাউকে পালাক্রমে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলেছে কিংবা নদীতে নিক্ষেপ করেছে।

প্রিয় পাঠক! আপনাদের যদি ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটে তাহলে সেদিন ময়দানের রক্তাক্ত, নির্মম কিছু উপাখ্যান তুলে ধরতে চাই। জাতি দেখুক, এতায়াতিরা কতটা হিংস্র ও পাষাণে পরিণত হয়েছে।

হাফেয শহীদুল ইসলাম।
পিতা: আমীনুল ইসলাম, গ্রাম: ওয়েস্টার্ন পাড়া, থানা: লালমোহন, জেলা: ভোলা। অবস্থান ও অধ্যয়ন: মুহাম্মদপুর ঢাকা-১২০৭

ছেলেটির বয়স উনিশ। হাফেযে কুরআন। কওমী মাদরাসার মাধ্যমিকের মেধাবী ছাত্র। একেবারেই নিম্নআয়ের অসচ্ছল পরিবারের সন্তান। হালকা গড়নের রুগ্ন-ক্ষীণকায় একটি শরীর। চেহারায় স্পষ্ট নম্রতার ছাপ। প্রথম দেখাতে যে কোন পাষাণের মনেও মায়া উথলে উঠবে। ছেলেটি ময়দানে আমার সাথেই ছিলো। কিছুক্ষণ জোর আওয়াজে কিতাবের তালীমও করেছিলো। তারপর বসে বসে তালীম শুনছিলো। এতায়াতিরা প্রথম যখন ময়দানের উত্তর দিকে বিদেশী মেহমানদের নিকটবর্তী গেইটের দিক হতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করেছিলো তখনি সে মাথায় আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আমি যখন দেখেছি তখন ওর মাথার তাজা রক্তগুলো গাল বেয়ে বুকে নেমে এসেছে। অসহায় আমি কিছুই করতে পারছিলাম না। নিজেকে কখনো অতোটা অসহায় মনে হয়নি। বারবার পেরেশান হয়ে যাচ্ছিলাম, কী হবে এখন? বা কী করবো এখন? চোখের সামনে একের পর এক ছাত্রদের তাজা রক্তে যমীন ভেসে যাচ্ছে। হতাহতদের নিয়ে কোথাও নিরাপদে বের হবো সেই সুযোগটাও নেই। চারদিক দিক দিয়েই ময়দান ওরা অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। এতায়াতিগুলো এতোটাই হিংস্র হয়ে ওঠেছে আহত মৃতপ্রায় ছেলেগুলোও হামলা থেকে রেহাই পাচ্ছিল না।

কয়েকজন ছাত্র দিয়ে আহত শহীদকে আমি মুরুব্বীদের মশওয়ারা কামরায় পাঠিয়ে দিলাম। আরো অনেক আহত সাথীরা সেখানে নিরাপদ ভেবে আশ্রয় নিয়েছিলো। তারপর কি হয়েছে, আমি বলতে পারবো না। ততক্ষণে আমরাও হামলার মুখে পড়ে গেছি। কোনমতে আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা শেষদিকের একটি গেট দিয়ে বের হয়ে এসেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আমার সাথে যেসব ছাত্র ছিলো তারপর আর ওরা আক্রান্ত হয়নি। আল্লাহ রক্ষা করেছেন। বাকি, হামলার শুরুতেই আমার আরও আশি-নব্বই জন ছাত্র বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। যাদের

প্রত্যেকেই এতায়াতিদের কোন না কোন হামলার শিকার হয়েছিলো। মারাত্মভাবে যখমী হয়েছিলো।

বলছিলাম, শহীদুল ইসলামের কথা। ওকে পাঠিয়ে দিয়েছি মুরুব্বীদের কামরায়। সেখানে আমি যাইনি। তবে শুনেছি, মুরুব্বীদের মশওয়ারা কামরাতেও ওরা তাণ্ডব চালিয়ে সব তছনছ করে দিয়েছিলো। আমার ছাত্র শহীদ তখনও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে সেখানেই যন্ত্রণায় ছটফট করছিলো। তার মুখেই শুনুন, সেই নির্মমতার কথা-

আমরা অনেকেই আহত হয়ে মুরুব্বীদের মশওয়ারার কামরায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। যখন দেখলাম, ওরা সবকিছুই ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে। যাকে পাচ্ছে তাকেই পিটিয়ে ক্ষতবিক্ষত করছে। তখন কম আহত সাথীরা যে যার মত করে এদিক সেদিক পালিয়ে গিয়েছিলো। আমরা চারজন খুব আহত থাকায় বাইরে বেরোতে পারিনি। কোনরকমে একটি টয়লেটে ঢুকে পড়েছিলাম। চারদিক থেকে আক্রান্ত উলামা-তৃলাবাদের আর্তনাদ শুনছিলাম। আর আসন্ন বিপদের কথা মনে করে আঁৎকে উঠছিলাম।

আমি আহত। পুরো শরীর রক্তে ভিজে গেছে। পাঞ্জাবীটাও গায়ের সাথে লেপটে আছে। মাথাটা ব্যথায় চিন চিন করছে। আগে থেকেই আমি অসুস্থ। মরণব্যাধি টি.বি. আমাকে কুঁড়েকুঁড়ে খাচ্ছে। চেহারায় তার আলামত স্পষ্ট। মনে করেছিলাম, হয়তো এসব দেখে ওদের একটু দয়া হবে। না, ওদের বিন্দুমাত্রও দয়া হয়নি। হঠাৎ ভারী কিছুর ক্রমাগত আঘাতে ওরা টয়লেটের দরজা ভেঙ্গে ফেললো। আমি তখনো প্যানের উপর পড়ে থেকে বাঁচার আকুতি করছিলাম। ষণ্ডা মতো একলোক এসে আমাকে টয়লে থেকে বের করে বাইরে ছুঁড়ে মারলো। ক্ষুধার্ত নেকড়ে অসহায় শিকারের উপর যেভাবে হামলে পড়ে দাঁড়িয়ে থাকা এতায়াতিগুলোও আমার উপর তেমনই উল্লাসে হামলে পড়লো। আমি একজনের পায়ে পড়ে প্রাণ-ভিক্ষা চাইছিলাম, দেখুন, আমার মাথাটা ফেটে কেমন হা হয়ে আছে, রক্তক্ষরণে নড়তে পারছি না, জিহবা-গলা সব শুকিয়ে গেছে। আমি মনে হয় বাঁচবো না, আমাকে বাঁচান। কিন্তু ওরা শুনেনি। একের পর এক আঘাত করেই যাচ্ছে, শরীরের কোন অংশই ওদের আঘাত থেকে রক্ষা পায়নি। আমি জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। মনে মনে কালিমা পড়ছিলাম।

ওদের নৃশংসতা এখানেই শেষ হতে পারতো কিন্তু হয়নি। একজন এসে আমার গলায় কোপ বসিয়ে দিলো। মনে করলাম, এই বুঝি আমি শেষ। হয়তো সেটাই ভালো হতো তখন আমার 'শহীদুল ইসলাম' নামের স্বার্থকতা অটুট থাকতো। তেমনটি হয়নি। কেন যেন তখন শেষবারের মতো দুমাস আগে দেখে আসা মায়ের মলিন মুখখানা চোখে ভেসে ওঠলো– মাকে হয়তো আর দেখতে পাবো না। জানি না, এই হিংস্র খুনিগুলো আমার লাশটা অভাগী মাকে দেখতে দিবে কিনা? সেবার বাড়ি থেকে মাদরাসায় ফেরার সময় আদরের ছোট বোনটিকে ঢাকায় নিয়ে আসি। সে আমার পাশেই এক হিফয বিভাগে পড়ে। প্রতিদিন বিকেলে ও আমার অপেক্ষায় থাকে। কোন দিন যেতে একটু দেরি হলেই হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। ওই মুহূর্তে বার বার মাদরাসায় অপেক্ষায় থাকা বোনটির কথাও মনে পড়ছিলো। ভাবছিলাম, আমার সাদাসিধে প্যারালাইজ্ড বাবা এই শোক সইতে পারবেন তো? বলতে পারেন? এমন ভয়ংকর মুহূর্তে কারো কি এতোসব মনে পড়ে? হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছিলো। আমি যে তখন জীবন শেষের মৃত্যু দেখছিলাম। কিন্তু আল্লাহ তা চাননি। কোপের আঘাতটি গলায় তেমন কোন ক্ষত করতে পারেনি। খুনিটা তারপরও থামেনি। আমার যে হাতগুলো দূর্বলভাবে নড়েচড়ে ওর কোপগুলো ঠেকানোর বৃথা চেষ্টা করছিলো সেটাতে সর্বশক্তি ব্যায় করে আর একটি কোপ বসিয়ে দিলো। তারপর কি হয়েছে আমি আর বলতে পারছি না। যখন জ্ঞান ফিরেছে তখন নিজেকে মশওয়ারা কামরার বাইরে পড়ে থাকতে দেখি। মনে হচ্ছে, জ্ঞান হারানোর পর ওরা আমাকে কামরার বাইরে ফেলে দিয়েছিলো। বাঁচার জন্য এদিক সেদিক তাকাচ্ছিলাম। পাশেই তখন মুহাম্মদপুরের আমাদের মসজিদের এক এতায়াতি সাথীকে দেখতে পেলাম। তাকে বললাম, ভাই! আমাকে একটু বাঁচান। সে আমাকে ফিরেও দেখেনি, তার আরেক সাথীর অজুহাত দেখিয়ে জলদি কেটে পড়েছিলো। বেশ অবাক হলাম, মানুষ এতোটা নির্দয়, নিষ্ঠুর হতে পারে? এতায়াতি হলেই কি এমন হিংস্র হতে হয়?

আমি সেখানেই পড়ে ছিলাম। একসময় দুই ভদ্রলোকের বোধহয় আমার প্রতি দয়া হলো। তারা আমাকে যত্ন করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। প্রাথমিক চিকিৎসার যাবতীয় খরচও বহন করলেন। সাথীরা যখন আমাকে নিয়ে আসার জন্য হাসপাতালে গেল, তখন তারা আমার সাথী ভাইদের হাত ধরে খুব কেঁদেছিলেন। বলছিলেন, আমরা বিভ্রান্তির শিকার। আমাদেরকে বলা হয়েছে, সাত ডিসেম্বরের 'জোড়' ত্রিশ নভেম্বর করার ফায়সালা হয়েছে। শুধু সেই দুই ভদ্রলোকই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন এমন নয়; বরং মিথ্যা বলে বলে এতায়াতিরা এমন অনেক সাধাসিধে ভাইদেরকে সেদিন বিভ্রান্ত করেছিলো এবং নৃশংস হামলায় শরীক করেছিলো। তারপর ভুল বুঝতে পেরে তারা তওবাও করেছিলেন। এখন তারা কেমন আছেন জানি না। আল্লাহ তাদেরকে কবুল করেন।

আমি আজও বিছানা থেকে উঠতে পারি না। আগের দুরারোগ্য টি.বি নতুন করে দেখা দিয়েছে। মাথার দুটি পাশই ফেটে যাওয়ায় এখনো ভীষণ যন্ত্রণা হতে থাকে। হাতের ক্ষতগুলোও ভালো করে শুকায়নি; পুঁজ হয়ে ফুলে আছে। এদিকে মাদরাসা ছেড়ে বাড়িতে একাকী পড়ে থাকাও যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারাক্ষণ দরস আর সাথীদের কথা মনে পড়ে। কখন যে চোখের পানি বুকে নেমে আসে নিজেও বলতে পারি না। অভাগী মা তখন কপালে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেন। হঠাৎ হঠাৎ ছোট বোনটি ঘরে ঢুকে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। আমি ভাবতে থাকি। ভাবনাগুলো খুব এলোমেলো হয়ে যায় এখন। বারবার মনে হয়, আমি কী পারবো আগের মতো দরসে ফিরে যেতে? পারবো একজন যোগ্য হক্কানী আলেম হতে?

প্রিয় পাঠক! টঙ্গীর ময়দানের সেই নৃশংস হামলায় এমন শত-শত 'শহীদুল ইসলাম' দরসগাহের পরিবর্তে হাসপাতালের বেডে অথবা ঘরে শুয়ে কাতরাচ্ছে। তাদের ক'জনের খবরই-বা আমরা জানি!

শির দেগা, নেহি দেগা আমামা

মাওলানা ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

প্রেক্ষাপট ১লা ডিসেম্বর। দুই হাজার আঠারো। যেদিন টঙ্গী ইজতেমার ময়দানের সংবাদে বারবার শিউরে উঠছিলাম। দরসে বসতে গিয়েও বসতে পারছিলাম না। পড়াতে গিয়েও স্থির থাকতে পারছিলাম না। হয়ে উঠছিলাম ছলোছলো, অশ্রুকাতর।

পাশের মসজিদে একটা দল ছিলো। ভোরেই ওরা ধেয়ে গেছে ময়দানে! পিকআপে করে নিয়ে গেছে যা নেয়ার। ঢাকা শহরের আরও অনেক মসজিদে এমন অনেক মানুষ জড়ো হয়েছিলো রাতের অন্ধকারকে আশ্রয় করে। আযানের আগে-পরে (ফজরের আগে আগে) ওরা মিশনে বেরিয়ে পড়েছিলো।

কিন্তু মনে এদের–এতো হিংস্রতা লুকিয়ে ছিলো–রাতের অন্ধকার কি জানতো?!! ভোরের স্নিগ্ধ শীত-সূর্যটা কি একটুও টের পেয়েছিলো?

সকাল এগারোটার তেতে ওঠা সূর্যও জানতো না– প্রশাসনের এইসব আশ্বাস–কী আড়াল করে রেখেছিলো! না, কেউ জানতো না, ইজতেমার এই 'পুণ্যভূমি' একটু পরেই হয়ে উঠবে–এক বধ্যভূমি! একটু পরেই এই তুরাগের তীরে নেমে আসবে ওই ফুরাতের নৃশংসতা!! কেউ জানতো না! জানতো শুধু এরা এবং এদের দোসররা!

এ কয়দিন ছোট্ট একটা লেখা লিখে আমি পাথর হয়ে বসে ছিলাম! দেখছিলাম আর শুনছিলাম ঘটে যাওয়া বর্বরতার কথা! নৃশংসতার কথা! সহ্য করতে পারছিলাম না! আবার বসলাম! বলে উঠলাম–

শির দেগা, নেহি দেগা আমামা!

শির তো নিয়েছোই! আমামা নিতে পারোনি! করেছো শুধু রক্তাক্ত! শোনো– কওমী মাদরাসাই তাবলীগ। তাবলীগই কওমী মাদরাসা! কওমী মাদরাসা থেকে তাবলীগ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। তাবলীগ থেকে কওমী মাদরাসা আলাদা করতে পারবে না। কোনো ছল-চাতুরি কাজে আসবে না। কোনো অশোভন প্রলোভনেও শেষ রক্ষা হবে না। তোমরাই বিচ্ছিন্ন হয়ে বিচ্ছিন্ন দ্বীপে নিক্ষিপ্ত হবে। সে সময় কি খুব দূরে?

কে বলেছে– এই হিংস্রতায় হযরতজী ইলিয়াস রহ.-এর তাবলীগ আছে?

খুঁজে খুঁজে ছাত্র মেরেছো! ছাত্রের উস্তায ও শিক্ষক পিটিয়েছো! ছোট ছোট শিশুকে ধরে ধরে আছাড় দিয়েছো! ভয় দেখিয়েছো! ওদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছো। হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছো! তোমাদের সবাই হয়ে উঠেছিলো– একেকটা দ্বি-পদ দানব! তোমাদের দানবীয় তাণ্ডবের দৃশ্যচিত্র এখন চোখে চোখে; ঢাকতে পারবে না, আড়াল করতে পারবে না।

তোমাদের পৈশাচিকতার কথা আর বলবো না–বলতে পারবো না! ১লা ডিসেম্বরের অন্ধকার রাত আর ভোরের স্নিগ্ধ সকালকে সাক্ষী রেখে শুধু বলি–

আমরা প্রতিশোধ নেবো না! কিন্তু হক-এর ঝাণ্ডা মাটিতে পড়তে দেবো না! আগলে রাখবো–বুকে! হাতে! বাহুতে! তারপরও না পারলে লুটিয়ে পড়বো–শাহাদতের লাল বিছানায়। আগামী দিনের ইতিহাসে লাল কালি দিয়ে লেখা হবে– তোমরা ভ্রষ্ট ছিলে! ভ্রষ্ট সাদের ভ্রষ্টপূজারী ছিলে! অশ্রুময় টঙ্গীকে করেছিলে মজলুমের রক্তে রঙিন! তোমরা ফুরাত টেনে এনেছো তুরাগে! হ্যাঁ, তোমরা...।

সাদপন্থী এতায়াতিদের হিংস্রতা আমি স্বচক্ষে দেখেছি

মুফতী আব্দুল্লাহ মায়মুন

উলামা-তলাবার উপর নিকট অতীতের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের কথা বলা হলে সর্বপ্রথম শাপলাচত্বরের কথা স্মরণ হয়। কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকে বিবেচনা করলে, টঙ্গী ময়দানে উলামা-তলাবার উপর সাদপন্থীদের হামলা হিংস্রতার দিক দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে শাপলাচত্বরকেও ছাড়িয়ে যায়।

উভয় বিপর্যয়ের তুলনামূলক কিছু পার্থক্য তুলে ধরি।

১- শাপলাচত্বরে তিন দিক থেকে যৌথবাহিনী হামলা করলেও এক দিকে বের হওয়ার রাস্তা খোলা ছিল। কিন্তু টঙ্গী মাঠে হামলাটা চতুর্দিক থেকেই হয়েছিল, বের হওয়ার কোনো রাস্তাই ছিল না।

২- শাপলাচত্বরে বিভিন্ন অলি-গলিতে লুকিয়ে থাকা এবং পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করা ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়নি। তাদেরকে নিরাপদে চলে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু টঙ্গী ময়দানে লুকিয়ে থাকা সাথী ও আত্মসমর্পণ করা উস্তাদ-ছাত্রদেরকে দফায় দফায় আঘাত করে জীবন্ত লাশ বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

নিম্নে কয়েকজন ব্যক্তির উপর হামলার বিবরণ তুলে ধরলে বিষয়টা আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ!

১- মুফতী জাকির হুসাইন। জামি'আ কারীমিয়া, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জের নায়েব মুহতামিম। নারায়ণগঞ্জ মারকাযের শূরার সদস্য ইঞ্জিনিয়ার জাহাঙ্গীর সাহেবের মেয়ের জামাই। তাবলীগের একসালের সাথী। নারায়ণগঞ্জ মারকাযে মাঝে-মধ্যে বয়ান করেন, হায়াতুস সাহাবার তালীম করেন। তিনি সে সময় তিনদিনের জন্যে টঙ্গীর ময়দানে ছিলেন। এতায়াতিরা তাঁকে মেহমানখানা থেকে ধরে নিয়ে আসে। এরপর প্রথমে একদল পিটায়, লাঠি-কাঠের টুকরা ইত্যাদি দিয়ে। এখান থেকে একটু যাওয়ার পর আরেকদল এসে পিটায়। এরা তাঁকে বলে, 'তুই নারায়ণগঞ্জ মারকাযে বয়ান করিস না? তুই ইঞ্জিনিয়ার জাহাঙ্গীর সাহেবের মেয়ের জামাই না?' এই সব বলে তাঁকে আরো বেশি রক্তাক্ত করে। এভাবে তাঁর সারা শরীর, পা থেকে মাথা পর্যন্ত রক্তাক্ত হয়ে যায়। এতকিছুর পরেও তিনি পা টেনে টেনে কোনোভাবে বের হচ্ছিলেন। তখন পিছন থেকে এক বৃদ্ধ এসে উনার মাথায় আঘাত করে। দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে তিনি বসে পড়েন। তখন তারা তাঁকে ফরেনট্যান্টের গেটের ওই দিকে কামারপাড়া স্কুলের দেয়াল থেকে নিচে ফেলে দেয়। এতক্ষণে তিনি হুঁশ হারানোর উপক্রম। একপর্যায়ে স্কুলের কিছু ছাত্র তাঁকে ধরাধরি করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়।

এখনও তিনি চিকিৎসাধীন আছেন। পুরো শরীর ক্ষত-বিক্ষত। তীব্র যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। না পারেন বসতে, না পারেন ভালোভাবে শুয়ে থাকতে। ডাক্তার তাঁকে একমাস ফুলরেস্টের নির্দেশ দিয়েছেন।

সাধারণ দীনদার স্কুল ছাত্রদের অন্তরেও যেটুকু মানবতা আছে, এতটুকু মানবতাও এই হিংস্রদের ভেতর দেখা যায়নি! শুনেছি, মাঝে-মধ্যে পাথর থেকেও নাকি পানি বের হয়, কিন্তু এই পাষণ্ডদের অন্তর ছিল পাথরের চেয়েও কঠিন।

২- মাওলানা আবু ইউসুফ সাহেব দা.বা.। কেরানীগঞ্জ সাতগাঁও মাদরাসার নায়েবে মুহতামিম। তিনি এলাকার সাথী ও ছাত্রদেরকে নিয়ে টঙ্গী ময়দানে গিয়েছিলেন। কিন্তু ময়দানে যাওয়ার পর দেখা গেল, তার সঙ্গে আসা এলাকার সাথীরাই তার উপর হামলা করে বসল।

এরা মিত্রের বেশে শত্রু, মুমিনের পোশাকে মুনাফিক। তারা তাঁকে এই পরিমাণ আঘাত করে যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। তিনি মারা গেছেন ভেবে তারা তাঁকে মাঠের বাইরে ফেলে দেয়। সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন অবস্থায় নদীর পাশের বেদে নারীরা তাঁকে উদ্ধার করে।

এখন তাঁর মাথায় দশটা সেলাই দেয়া হয়েছে। চিকিৎসাধীন আছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, বেদে নারীদের ভেতর যেটুকু মনুষ্যত্ব আছে এটুকু মনুষ্যত্ব কি নেই এই এতায়াতি হায়েনাদের?

৩- মুবারক হুসাইন। জামি'আ কারীমিয়া, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জের ইফতা বিভাগের ছাত্র। হামলার সময় সে আত্মরক্ষার জন্যে তিনতলার ছাদে আশ্রয় নেয়। হঠাৎ দেখে পাঁচজন এতায়াতি তাকে ঘিরে ফেলেছে। সে একজনকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে। তার ধারণা ছিল তাকে ছাদ থেকে ফেলে দেয়া হবে। এই আশঙ্কায় সে এই কৌশল অবলম্বন করে। সে ওই এতায়াতিকে জড়িয়ে ধরার পর বলে, 'আপনি আমার ভাই, আমাকে মারবেন না।' কিন্তু অন্যরা তাকে আঘাত করা শুরু করে, এভাবে তারা মারতে মারতে নিচে নিয়ে আসে। একপর্যায়ে তারা জিজ্ঞেস করে, 'তুই কি মুসলমান? মুসলমান হলে কালেমা পড়'! সে কালেমা পড়ে! তারা জিজ্ঞেস করে, তোর আমীর কে? সে জবাব দেয়, 'সাদ সাহেব'! জবাবে তারা বলে, 'হয়নি', বল, 'মাওলানা সাদ সাহেব দামাত বারাকাতুম!' প্রাণ বাঁচাতে সে তা-ই বলে। তখন তারা বলে, 'দৌড় দে!' সে বলে, 'আমি দৌড় দিতে পারবো না, পায়ে ব্যথা।' তারা বলে, তাহলে আমাদের দিকে পিঠ দিয়ে সামনের দিকে চল। সে হাঁটা শুরু করলে পিছন থেকে তাদের একজন তার কোমরে লাথি মারে। লাথির প্রচণ্ডতায় সে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়! আহ, কী ভয়াবহ বর্বরতা...!

৪- যাকারিয়া হুসাইন। জামি'আ কারীমিয়ার উলুমুল হাদীস বিভাগের ছাত্র। সে হামলার শিকার হয়ে আহত অবস্থায় নদী সাঁতরে ওপাড়ে চলে আসে। নদী পার হওয়ার পর প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে। তার বক্তব্য হল, জ্ঞান ফেরার পর দেখি, আমার মত আরো অনেকের সাথে আমি একটা কুঁড়ে ঘরে পড়ে আছি। পরে জানতে পারি, কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তি আমাদেরকে উদ্ধার করে সেবা-যত্নের জন্যে এখানে নিয়ে এসেছেন।

৫- আশিক বিল্লাহ ইউসুফ। জামি'আ কারীমিয়া নারায়ণগঞ্জের ইফতা বিভাগের ছাত্র। এতায়াতিরা প্রথমে তার পাঞ্জাবী-গেঞ্জি ছিড়ে ফেলে। তার মোবাইলটা ছিনিয়ে নেয়। এরপর উপর্যুপরি আঘাত করে তার হাত ভেঙ্গে দেয়। এখনও তার হাত গলায় ঝুলানো।

কয়েকজন ছাত্রের মৌখিক বিবরণ থেকে জানা যায়, এতায়াতিরা যখন তাদেরকে নির্দয়ভাবে মারতে শুরু করে, তখন তারা সহ্য করতে না পেরে হামলকারীদের পায়ে ধরে বলে, 'আমি আপনার ছেলের মতো, নাতির মতো, আমাকে মারবেন না'। তাদের একই করুণ আকুতিতেও ঐ পাষণ্ডদের অন্তরে সামান্য পরিমাণ দরদ জন্মেনি। এরাই নাকি আবার নবীওয়ালা কাজের মূলধারার ধারক-বাহক!

ছাত্ররা আরো বলেছে, 'বাবার বয়সী, দাদার বয়সী বৃদ্ধদের দেখে আমরা প্রত্যাঘাত করিনি। কিন্তু এই বর্বর এতায়াতিরা আমাদেরকে ছেলের বয়সী, নাতির বয়সী দেখেও আমাদের প্রতি বিন্দু পরিমাণ দয়া দেখায়নি।'

এ-তো গেলো ওইসব আহতদের বিবরণ, যারা অনেকটা কথা বলতে পারেন, কিন্তু এখনো এরকম অনেক আহত আছেন যারা এখনও পর্যন্ত ডাক্তারের নিবিড় পর্যবেক্ষণে (আইসিউতে) রয়েছেন। তারা সুস্থ হলে শোনা যাবে সাদপন্থীদের নির্মম হামলার লোমহর্ষক দাস্তান!

আমার জানামতে বাংলাদেশে একসাথে এত উলামা-তলাবাকে আর কোথাও এমন নৃশংস কায়দায় হামলা করা হয়নি!

মেসার্স রাজিব এন্টারপ্রাইজ

প্রো. হাফেজ মাওলানা রহমতুল্লাহ

সরাসরি সিলেটের ভোলাগঞ্জ ও
জাফলং থেকে গুণগত মানসম্পন্ন
পাথর ও সিলেকশন বালু
সরবরাহের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

এল.সি কালো পাথর
আমদানীকারক

এল.সি. কালো পাথর, সিঙ্গেল, বোল্ডার ভাঙ্গা, ভুতু ভাঙ্গাসহ সর্বপ্রকার নির্ভেজাল ও লোয়ালিফাইড পাথর এবং সিলেকশন বালু সুলভ মূল্যে সারাদেশে সরবরাহ করা হয়।

ঢাকা অফিস
৪১/৯ সি হাজী আফসার উদ্দীন লেন
ঝিগাতলা, ধানমণ্ডি, ঢাকা
০১৭১৬৭১০৭১১

ভোলাগঞ্জ অফিস
শাকুরা পাম্পের দক্ষিণে
কোম্পানীগঞ্জ ভোলাগঞ্জ, সিলেট
০১৮১৬৪৩৮৮১২

দু'আয়ে মাগফিরাতের আবেদন

২ নভেম্বর ২০১৮ পাকিস্তানের বিশিষ্ট আলেমে দীন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের শীর্ষ-মুরুব্বী হযরত মাওলানা সামিউল হক হক্কানী রহ. অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে শহীদ হয়েছেন।

১৮ নভেম্বর প্রথম হযরতজী ইলিয়াস রহ.-এর হাতেগড়া শাগরেদ, তৃতীয় হযরতজী ইন'আমুল হাসান রহ. কর্তৃক গঠিত তাবলীগ জামা'আতের আলমী শূরার অন্যতম সদস্য, পাকিস্তান রায়বেন্ড মারকাযের যিম্মাদার হাজী আব্দুল ওয়াহহাব সাহেব রহ. ইন্তেকাল করেছেন।

২৫ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে মারকাযুদ্দাওয়ার মুহতারাম মুদীর হযরত মুফতী আব্দুল্লাহ সাহেব ও মুহতারাম আমীনুত তা'লীম হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দামাত বারাকাতুহুমার পিতা, খেড়িহর মাদরাসার সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরের মুহতামিম হযরত মাওলানা শামসুল হক রহ. ইন্তেকাল করেছেন।

৮ জানুয়ারি ২০১৯ উজানীর ক্বারী ইবরাহীম সাহেব রহ.-এর দৌহিত্র, উজানী মাদরাসার শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা শরীফ জালাল রহ. ইন্তেকাল করেছেন।

পাঠকের কাছে মরহুম হযরতগণের মাগফিরাত ও দারাযাত বুলন্দির জন্য দু'আ অব্যাহত রাখার আবেদন জানানো যাচ্ছে।

উল্লিখিত হযরতগণের ইন্তেকালে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিব্যক্তি ছাপা হয়েছে। সেখান থেকে ইন্তেকালের ধারাবাহিকতায় তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল– ***সম্পাদক***

একটি জানাযার সাক্ষ্য

হামিদ মীর

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন, 'আমাদের জানাযা আমাদের সঠিকতার ফায়সালা করবে।' যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন, তখন বাগদাদে লাখ লাখ মানুষ তার জানাযায় শরীক হয়েছিলেন। তার জানাযার মাহাত্ম্য দেখে হাজার হাজার অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। গত ৩ নভেম্বর আকোড়া খাটাকে মাওলানা সামিউল হকের জানাযায় অংশগ্রহণকারী একাধিক আলেম আমাকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর ওই উক্তি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, এ জানাযা দেখুন এবং মাওলানা সামিউল হকের সঠিকতার ফায়সালা করুন।

এ বিশাল জানাযায় অংশগ্রহণকারী বহু লোকেরই মাওলানা সামিউল হকের রাজনীতির সাথে কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। তারা একজন আলেমে দীনকে এ ধরা থেকে বিদায় দিতে এসেছিলেন, যাকে জুমু'আর দিন (২ নভেম্বর) আসরের সময় শহীদ করা হয়েছে। যারা শহীদ করেছে, তারা এমন এক সময়কে বেছে নিয়েছে, যখন পুরো দেশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননা সমস্যা নিয়ে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে। খোদ সামিউল হককেও শাহাদাতের কিছুক্ষণ আগে তার জীবনের শেষ ভাষণে এ সমস্যা নিয়ে বেশ অস্থির মনে হচ্ছিল। তার জানাযা অস্থিরতাকে বৃদ্ধির পরিবর্তে তা নিরসনের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

মাওলানা সাহেবের শাহাদাতের ব্যাপারে নানা ধরনের বিশ্লেষণ হচ্ছে। কেউ বলেছেন, 'ফাদার অব তালেবান' দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। কেউ বলেছেন, তার আকোড়া খাটাকের ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাদরাসা দারুল উলূম হাক্কানিয়া 'নার্সারি অব জিহাদ' বা জিহাদের আঁতুড়ঘর ছিল। আর কিছু ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়ের তো এটা মোটেই পছন্দ হয়নি যে, মাওলানা সাহেবকে কেন 'শহীদ' বলা হচ্ছে। এটাই সেই উগ্রবাদী চিন্তাভাবনা, যা দিন দিন আমাদের মধ্যে বিলি করা হচ্ছে। যে মাওলানা সামিউল হককে জানি, তিনি সর্বদা হাসিমুখে ভিন্নমত সহ্য করার মানুষ ছিলেন। তার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল ১৯৮৮ সালে দৈনিক জং লাহোরের সিনিয়র সহকর্মী মরহুম জাভেদ জামাল দিসকাভির মাধ্যমে। ওই সময় মাওলানা সামিউল হককে জেনারেল জিয়াউল হকের জোটভুক্ত মনে করা হতো। আর আমি তৎকালীন সামরিক সরকারের কঠোর বিরোধী ছিলাম। তথাপি মাওলানার সাথে এমন এক ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে গেল, যা তার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বলবৎ থাকে। অকপটে স্বীকার করি, এ সম্পর্ক ধরে রাখার ব্যাপারে মাওলানা সাহেবের ভূমিকাই ছিল বেশি। তিনি প্রতিটি দুঃসময়ে আমার ডাকা ব্যতীত নিজেই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে যেতেন। আমার কারণে তিনি যেসব চাপের মুখোমুখি হতেন, তা কখনো বলতেন না। কয়েক বছর আগে সোয়াতে মালালা ইউসুফজাইয়ের ওপর আত্মঘাতী হামলা হলে, নামসর্বস্ব তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান তার দায় স্বীকার করেছিল। আমি ওই হামলার নিন্দা করলে ওই সংগঠনের মুখপাত্র এহসানুল্লাহ এহসান আমার বিরুদ্ধে কুফরের ফতওয়া জারি করেন। এরপর আমার গাড়ির নিচে বোমা রাখা হয়। এহসান এর দায় স্বীকার করেন। ওই সময় মাওলানা সামিউল হক নিজে ইসলামাবাদ চলে আসেন এবং আমাকে বলেন, 'বলো, কার বিরুদ্ধে কী বলতে হবে। আমি তোমার পাশে আছি।'

করাচিতে আমার ওপর যখন আত্মঘাতী হামলা হলো, তখন তার ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়, তিনি যেন জিয়ো টিভি ও আমার বিরোধিতা করেন। কিছু 'ইসলামের মুজাহিদ' যখন আমাদের বিরুদ্ধে গাদ্দারী ও কুফরের ফতওয়া জারি করলেন এবং আমাদের কুশপুত্তলিকাও পোড়ালেন, ওই সময় মাওলানা সাহেব কোনো ফরমায়েশী ফতওয়া দিতে অস্বীকার করেন।

২০১৬ সালে কিছু শক্তিধর মানুষ রিসালাত অবমাননার মিথ্যা অপবাদকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। আমি আত্মসম্মানবোধের নামে

হত্যার বিরুদ্ধে একটি কলাম লিখলে তাতে রিসালাত অবমাননার গন্ধ তালাশ করে আমাকে একটি মামলায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়। ওই সময় আরো একবার মাওলানা সামিউল হক আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন।

তিনি আকোড়া খাটাকের দারুল উলূম হাক্কানিয়া থেকে আমার পক্ষে এক বিস্তারিত ফতওয়া জারি করান। এতে বলা হয়েছে, 'কোনোরূপ যাচাই ছাড়া কারো বিরুদ্ধে ফতওয়া প্রদান বা তার বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গোনাহ।' আমার পক্ষে জামি'আ আশরাফিয়া লাহোর ও জামি'আ নাঈমিয়া লাহোরসহ অনেক মাদরাসা থেকেও ফতওয়া জারি করা হয়। তবে দারুল উলূম হাক্কানিয়া থেকে মুফতী মুখতারুল্লাহ হাক্কানির জারি করা ফতওয়া বেশ বিস্তারিত ও পরিপূর্ণ ছিল। আর যখন কিছু প্রতাপশালী ব্যক্তি, আমাকে সহযোগিতা করার কারণে মাওলানা সামিউল হকের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন, তখন তিনি তাদের অসন্তোষকে মুচকি হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিলেন।

খোদ সামিউল হককেও তার জীবনে বেশ কয়েকবার মিথ্যা অপবাদের মুখোমুখি হতে হয়েছে। ১৯৯১ সালে এমন একটি মিথ্যা অপবাদ তার ওপর আরোপ করা হয়েছিল, আতাউল হক কাসেমীও যার কথা তার কলামে উল্লেখ করেছেন। মাওলানার ওপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির জন্য দুশ্চরিত্রের এক মহিলাকে তার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সে কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি। মাওলানা রাজনীতির ময়দানে দুর্বল ছিলেন। বড় বড় দল মাওলানাকে ইসলামের নামে ব্যবহারের চেষ্টা করেছে।

কয়েক বছর ধরে মাওলানা সামিউল হক লেখালেখি ও গবেষণার প্রতি বেশ মনোযোগী হয়েছিলেন। ২০১৫ সালে তিনি ১০ খণ্ডের 'খুতুবাতে মাশাহির' প্রকাশ করেন, যেখানে হাক্কানিয়ার মিম্বরে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কৃত বয়ান এবং 'আল হক' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোকে বিষয়ভিত্তিক আকারে সঙ্কলন করা হয়েছে।

'খুতুবাতে মাশাহির'-এর প্রথম খণ্ডে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক মুহতামিম কারী তৈয়ব রহ.-এর একটি বক্তৃতা শামিল করেছেন, যেখানে ধর্ম এবং ধর্মীয় নিদর্শনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আলেমদের একে অন্যের প্রতি বেয়াদবী এবং একে অন্যকে হেয়প্রতিপন্ন করা উচিত নয়। বেশ কিছু ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, কিন্তু কোথাও সামান্যতম বেয়াদবীকেও স্থান দেননি। একবার কাসেম নানুতবী দিল্লির 'লাল কূপধারী' মসজিদের ইমামের পেছনে ফজরের নামায পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কেননা তার কিরাআত বেশ সুন্দর। মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব নানুতবী সাহেবকে বললেন, ওই ইমাম তো আপনাকে কাফের বলেন! তবুও নানুতবী পরের ফজর নামাযে শিষ্যদের সাথে নিয়ে নামায পড়তে লাল কূপধারী মসজিদে পৌঁছলেন। নামায শেষ হলে মসজিদের ইমাম জানতে পারলেন, তার পেছনে নামাযীদের মধ্যে মাওলানা কাসেম নানুতবী ও মাওলানা মাহমুদুল হাসানও শামিল হয়েছেন। তিনি বেশ লজ্জিত হলেন এবং তাদের সাথে মুসাফাহা করে লজ্জার কথা প্রকাশ করলেন। নানুতবী তার ওই ভুল ধারণা দূর করলেন, যার কারণে তিনি তাকে কাফের বলতেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননাকারীকে কাফের সাব্যস্ত করা ওয়াজিব, তবে অবমাননার সঠিক যাচাইও ওয়াজিব।'

মাওলানা সামিউল হক ২০১৬ সালে তার রোযনামচা প্রকাশ করেছেন। এ রোযনামচা ওই সাহেবদের অবশ্যই পড়া উচিত, যারা মাওলানাকে 'ফাদার অব তালেবান' (তালেবানের জনক) বলে থাকেন। মাওলানার বাবা শ্রদ্ধেয় মাওলানা আব্দুল হক সাহেব দরবেশ হাজী তুরাঙ্গযায়ী রহ.-এর হাতে বাইয়াত নিয়েছিলেন। খান আব্দুল গাফফার খান (বাচা খান)-ও তুরাঙ্গযায়ী রহ.-এর ভক্ত ছিলেন।

আর মাওলানা সামিউল হক তার রোযনামচায় বাচা খানের সাথে হওয়া ওই কথোপকথন শামিল করেছেন, যেটা হাজী তুরাঙ্গযায়ী রহ.-এর সশস্ত্র আন্দোলনের ব্যাপারে হয়েছিল। ওই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল উপমহাদেশ থেকে ইংরেজ খেদানো। এ রোযনামচায় কোথাও ওলি খানের দারুল উলুম হাক্কানিয়ায় আগমনের কথা উল্লেখ রয়েছে, কোথাও রয়েছে আজমল খাটাকের কথা, কোথাও হরিপুর কারাগারে মাওলানা মুফতী মাহমুদের সাথে কাটানো বন্দী সময়ের স্মৃতিকথা, কোথাও রয়েছে লাহোরে দাতা গঞ্জবখশ রহ.-এর মাজারে ফাতেহা পাঠ এবং মাওলানা বাহাউল হক কাসেমীর সাথে সাক্ষাতের কথা। ওই রোজনামচায় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর শানে কবিতাও নজরে পড়ে। এতে বাংলাদেশের ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত হজরত শাহ আলী বাগদাদী রহ.-এর মাজার জিয়ারতের কথাও রয়েছে।

মাওলানা সাহেব আফগান তালেবানের ব্যাপারে ইংরেজিতে একটি গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, বহু আফগান তালেবান তার মাদরাসার সাবেক ছাত্র। তবে তিনি তার মাদরাসার পাকিস্তানী ছাত্রদের আফগানিস্তানে লড়াইয়ের জন্য পাঠাতেন না।

মাওলানা তার এক ছাত্র মুহাম্মাদ ইসরার মাদানীর মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফিকাহ অ্যাকাডেমি জেদ্দা কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ 'জাদীদ ফিকহী ফায়সালে' নামে প্রকাশ করিয়েছেন এবং তার ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন। ওই ভূমিকায় তিনি এ গ্রন্থকে সব দীনী মাদরাসার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার ওপর জোর দেন। এ গ্রন্থে আধুনিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোর সমাধান কুরআন ও হাদীসের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। মাওলানার এ ভূমিকা তার নিষ্ঠা এবং ইসলামের সাথে তার গভীর সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি। তার এ নিষ্ঠাই আমার মতো দুনিয়াদার ও গুনাহগার মানুষকে তার জানাযায় নিয়ে গেছে। এটা সেই জানাযা, যা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর ওই কথাকে সত্য প্রমাণিত করেছে- 'আমাদের জানাযা আমাদের সঠিকতার ফায়সালা করবে।' (ঈষৎ সংক্ষেপিত)

লেখক : পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

উর্দু থেকে ভাষান্তর : ইমতিয়াজ বিন মাহতাব

(দৈনিক নয়াদিগন্তের সৌজন্যে)

চলে গেলেন দাওয়াত ও তাবলীগের দরদী দাঈ হাজী আব্দুল ওয়াহ্হাব সাহেব রহ.

মুফতী মুহাম্মাদ ওয়াক্কাছ রফী

'যখন তোমরা চার জিনিসকে ক্লান্ত করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হেদায়াতের সূর্য বানিয়ে দিবেন। ১. বাকশক্তিকে দাওয়াতে ২. পদযুগলকে গাশতে ৩. দেমাগকে ফিকির ও অস্থিরতায় ৪. চক্ষুদ্বয়কে অশ্রু প্রবাহে। আর এটা এমনভাবে করতে হবে যে, যবান কথা বলতে অক্ষম হয়ে যায়, পদযুগল চলতে অস্বীকার করে দেয়, মাথায় ফোঁড়ার যন্ত্রণা অনুভূত হয় এবং চক্ষুদ্বয় কাঁদতে কাঁদতে শুকিয়ে যায়'– প্রবাদতুল্য এ কথা যিনি অন্যদেরকে শোনাতেন এবং নিজে আমল করে উম্মতকে দেখিয়ে দিয়েছেন, তিনি হলেন পাকিস্তানের রায়বেন্ড মারকাযের মুরুব্বী হাজী আব্দুল ওয়াহ্হাব ছাহেব রহ.।

১৯২৩ সালে হিন্দুস্তানের দিল্লি শহরে হাজী ছাহেবের জন্ম। শৈশবেই কুরআন মাজীদ ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর লাহোর ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে জেনারেল শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তহশীলদারীর চাকুরীর মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। কলেজে শিক্ষাকালীন মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী রহ.-এর সাথে ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করেন। অতঃপর হযরত আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ.-এর সাথেও সম্পর্ক গড়ে নেন। এর ফলে শিক্ষা-দীক্ষা উভয় দিকেই তিনি মজবূতি অর্জন করেন। উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয়ের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে 'মজলিসে আহরারে ইসলাম'-এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তিনি এর সঙ্গে সংযুক্ত হন। এ সময় প্রচলিত দাওয়াত-তাবলীগের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর কাছে আসা-যাওয়া শুরু করেন। একসময় হযরতজীর মহান ব্যক্তিত্ব তার উপর এতোটাই প্রভাব বিস্তার করে যে, তিনি ওতপ্রোতভাবে তাবলীগের কাজে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং এই কাজের জন্য নিজের সর্বস্ব ওয়াকফ করে দেন। চাকরী-বাকরী, আয়-উপার্জন বিলকুল ছেড়ে দেন। সন্তানাদি তো ছিলোই না, স্ত্রীও কিছুদিন পর ইন্তেকাল করেন। এরপর তিনি নিজের পূর্ণ সময় দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য ওয়াকফ করে দেন।

১৯৪৮ সালে হিন্দুস্তান বিভক্তির পরপরই হিন্দুস্তান থেকে পাকিস্তানের করাচীতে হাজী সাহেবের তাশকীল হয়। ১৯৫২ সালে হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্ধলবী রহ.-এর পাকিস্তান সফরের পর রায়বেন্ডে তাশকীল হয়। হাজী সাহেব যখন রায়বেন্ড এসেছিলেন তখন মারকাযের জায়গাটা বাবলা গাছ আর কাঁটাদার ঝোপঝাড়ে আকীর্ণ ছিল। বর্তমানে যেখানে নতুন মসজিদ অবস্থিত, সেখানটায় হিন্দুদের মড়া পোড়ানো হতো। থাকা-খাওয়ার কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। লতা-পাতা দিয়ে বানানো একটি ঝুপড়িঘর মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। গাশত ও সাক্ষাতের জন্য পায়ে হেঁটে লাহোর আসতে হতো। অতঃপর হাজী সাহেবের মুখলিসানা ফিকির ও নিরলস প্রচেষ্টার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা সেই জনশূন্য স্থানকে মানুষ গড়ার কেন্দ্রে পরিণত করেছেন। অতঃপর রায়বেন্ড মারকায থেকে শিক্ষা-দীক্ষার এক ঝর্নাধারা উৎসারিত হয়েছে এবং দাওয়াত-তাবলীগের বসন্ত-বাতাস প্রবাহিত হয়েছে।

দাওয়াত ও তাবলীগের সিলসিলায় হাজী সাহেবের দেশ-বিদেশ সফর তো আরেক দাস্তান। তিনি তার পুরো জীবন ইসলামের প্রচার-প্রসারে কাটিয়ে দিয়েছেন। দেশ-বিদেশে দাওয়াতের মেহনতে তার অক্লান্ত পরিশ্রম যে কাউকে ঈর্ষান্বিত করে। হাজারো অমুসলিম তার কাছে কালিমা পড়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

১৯৪৮ থেকে ২০১৮ ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি রায়বেন্ড মারকাযেই কাটিয়েছেন। এখানে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত তিনি তাবলীগী মেহনতের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। অতঃপর ১৯৬০ সালে মারকাযে যখন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হলো, তখন মাদরাসা পরিচালনার দায়িত্বও তাকে অর্পণ করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আমৃত্যু তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের অভূতপূর্ব খেদমত করে গেছেন।

১৯৯২ সালে (পাকিস্তানের সাবেক যিম্মাদার) হাজী মুহাম্মাদ বশীর সাহেবের ইন্তিকালের পর তাকেই পাকিস্তানের দাওয়াত ও তাবলীগের যিম্মাদার নির্ধারণ করা হয়।

হাজী সাহেব যদিও নিয়মতান্ত্রিক কোন হাফেয-আলেম ছিলেন না, কিন্তু তাবলীগের মেহনত ও অক্লান্ত দাওয়াতী প্রচেষ্টার বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাকে কুতুব-আবদালদের মর্যাদা দান করেছিলেন। তার হৃদয়ে উম্মতের প্রতি দরদ ও ফিকির পুরে দেয়া হয়েছিলো। তিনি সর্বদা এই প্রচেষ্টায় থাকতেন যে, কীভাবে পুরো উম্মতকে জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন থেকে বাঁচানো যায়! কীভাবে তাদেরকে আল্লাহ্‌র হুকুম ও নববী আদর্শের ওপর নিয়ে আসা যায়! তিনি দাওয়াত ইলাল্লাহকে আপন পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জা বানিয়ে নিয়েছিলেন। না খানা-পিনার চিন্তা করতেন, না আরাম-আয়েশের ফিকির করতেন। মনের মধ্যে শুধু এই একটা ফিকিরই লালন করতেন যে, কীভাবে আল্লাহ তা'আলার মনোনীত দীন দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া যায় এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত ও যিন্দেগীকে সবাই নিজের জীবনপাথেয় বানিয়ে নেয়।

এ ব্যাপারে মুহতারাম মাওলানা ইহসানুল হক সাহেব একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, ফিকির ও অস্থিরতা কাকে বলে তার তোমরা কী জানো! ফিকির কাকে বলে বুঝতে চাইলে হাজী সাহেবকে দেখো। একবার আমি (ইহসানুল হক) তার খেদমতে নাশতা নিয়ে হাজির হলাম। সে সময় মেহমানদের জন্য আলাদা কোন সময় বরাদ্দ থাকতো না; বিভিন্ন আমলের ফাঁকে সাক্ষাতের জন্য সময় বের করে নেয়া হতো। যা হোক, তিনি খাবারের লোকমা মুখের কাছে তুলে ধরলেন, অমনিই কয়েকজন মেহমান চলে আসল। তিনি তাদের সাথে দাওয়াতী আলোচনা শুরু করে দিলেন। আলোচনা চলতে থাকলো। একের পর এক মেহমানদের আনাগোনায় দাওয়াতী ফিকির প্রবল হয়ে গেলো। আনুমানিক বিয়াল্লিশ মিনিট পর হাতে ধরা সেই লোকমাটি তিনি মুখে নিতে পারলেন! আল্লাহু আকবার।

কয়েক বছর আগের এক জরিপে প্রকাশ পেয়েছে, বর্তমানবিশ্বে সবচেয়ে অধিক কথা বলা ব্যক্তি হলেন পাকিস্তানের

তাবলীগ জামা'আতের আমীর হাজী আব্দুল ওয়াহ্হাব সাহেব। কথাটির বাস্তবতা অনুধাবনে আমার নিজেরই একটি ঘটনা বলছি– ছাত্রবয়সে ২০০২ সালে আমি চিল্লায় গিয়েছিলাম। একদিন রায়বেন্ড মারকাযে বাদ ফজর আনুমানিক সাড়ে ছয়টায় হাজী সাহেবের বয়ান শুরু হলো। দীর্ঘসময় বয়ান চলতে লাগলো। টানা চার ঘণ্টা একজায়গায় বসে থেকে আমরা কয়েক সাথী ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। ক্লান্তি দূর করা এবং জরুরত পুরা করার জন্য বেলা এগারোটার দিকে মসজিদ থেকে বের হলাম। জরুরত পুরা করতে করতে ১টা বেজে গেলো। আমরা যোহরের নামাযের প্রস্তুতি নিয়ে পুনরায় মসজিদে প্রবেশ করলাম। আল্লাহু আকবার! তখনও হাজী সাহেবের বয়ান চলছিলো। আমরা বয়ানে বসে গেলাম। যখন পৌনে দুইটা বাজল এবং জামা'আতের সময় হয়ে গেলো, তিনি বয়ান শেষ করলেন এবং সবাইকে নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণের সময় দিলেন। এদিন তিনি বিরতিহীন সাড়ে সাত ঘণ্টা বয়ান করেছেন।

যবানের মতো দ্রুত হাঁটা-চলায়ও তার কোন জুড়ি ছিলো না। রোগ-শোক ও বিভিন্ন অসুবিধা সত্ত্বেও বৃদ্ধবয়সেও তিনি এতোটা দ্রুত হাঁটতে পারতেন যে, নওজোয়ানরাও তার সাথে কুলিয়ে উঠতে পারতো না। ২০০৭ সালে হজ্জের সফরের সময় তিনি হাঁটাচলায় অক্ষম হয়ে গিয়েছিলেন। হুইল চেয়ারে করে চলাফেরা করতেন। যখন হারামের পবিত্র ভূমিতে পৌঁছলেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস– 'যমযমের পানি যে নিয়তে পান করা হবে, তা পূরণ হবে।' –এর উপর একীন রেখে তিনি এই নিয়তে পানি পান করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে যেন পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেন এবং পুনরায় চলাফেরার শক্তি দান করেন। আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করলেন। তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন। সে সময় শাইখুল হাদীস মাওলানা জামশেদ আলী খান রহ.-ও চলাফেরা করতে পারতেন না। তাকেও হুইল চেয়ারে চলতে হতো। তাই হাজী সাহেব তাকে হারাম শরীফ থেকে ফোন করে নিজের ঘটনা শোনালেন যে, আমি যমযমের পানি এই নিয়তে পান করেছিলাম যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুস্থ করে দেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুস্থ করে দিয়েছেন। এখন আমি হুইল চেয়ার ছাড়াই সুস্থ মানুষের মতো হাঁটাচলা করতে শুরু করেছি। তাই আপনিও যমযমের পানি এই নিয়তে পান করুন এবং হুইল চেয়ার ছেড়ে নিজের পায়ে হাঁটতে শুরু করে দিন। মাওলানা জামশেদ সাহেবের শরীর যেহেতু হাজী সাহেবের তুলনায় ভারী ছিল, তাই হাজী সাহেবের কথার উপর আমল করে হুইল চেয়ার তো পরিত্যাগ করলেন, কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে প্রথমে কিছুদিন কষ্ট হয়েছিলো, কিন্তু কিছুদিন পর আল্লাহ্ তা'আলা তাকেও পুরোপুরি সুস্থ করে দিলেন। একেবারে শেষ বয়সে এসে যখন তিনি মা'যূর হয়ে গেলেন এবং আগেকার শক্তি ও হিম্মত রইল না, তখন আগের মতো হুইল চেয়ারে চলাফেরা শুরু করলেন।

হাজী সাহেবকে আল্লাহ তা'আলা ইখলাছ, আল্লাহভীতি ও তাকওয়া–তাহারাতের কারণে বাহ্যিক ও আত্মিক এমন অসামান্য দৌলত দান করেছিলেন যে, তিনি তার পুরা জীবনে এক আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে হাত পাতেননি। এ কারণে আল্লাহ তা'আলাও দুনিয়াকে তার পায়ের সামনে এনে ফেলে রেখেছিলেন। ওমানের গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'রয়্যাল ইসলামিক স্ট্র্যাটিজিক স্টাডিজ সেন্টার' ২০১৪-এর অক্টোবর মাসে বিশ্বের পাঁচশত প্রভাবশালী মুসলিম ব্যক্তিবর্গের তালিকায় হাজী সাহেবকে ১০ম স্থানে প্রকাশ করে।

একবার পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ ক্ষমতায় থাকাকালীন হাজী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য রায়বেন্ড মারকাযে উপস্থিত হলেন। হাজী সাহেব তাকে দীনের দাওয়াত দিলেন এবং আল্লাহ্র রাস্তায় সময় লাগানোর তাশকীল করলেন। নওয়াজ শরীফ বললেন, 'সময় তো আমার হবে না, তবে আপনার জন্য এই সামান্য হাদিয়া নিয়ে এসেছি। এই যে তিনশত আশি কোটি রুপির চেক, মেহেরবানী করে গ্রহণ করুন।' হাজী সাহেব প্রতিউত্তরে বললেন, মিয়াঁ সাহেব! আপনার রুপির আমার প্রয়োজন নেই, আমার তো প্রয়োজন আপনার সময়ের; আপনি শুধু আমাকে তিন দিন সময় দিয়ে দিন! নওয়াজ শরীফ বললেন, 'জানেন তো কী ব্যস্ততা! আমার কাছে সময় নেই, আমি আপনার কাঙ্ক্ষিত তিন দিন দিতে পারব না।' হাজী সাহেব বললেন, তাহলে আপনার এই দানেরও আমার কোন জরুরত নেই! আপনি এটা ফিরিয়ে নিন। নওয়াজ শরীফ তো আর জানতেন না যে, এই মুকুটহীন সম্রাটের কাছে মাটির ঢেলা আর স্বর্ণমুদ্রায় কোন পার্থক্য নেই! এজন্য তিনি সম্পদের গর্বে মদমত্ত হয়ে বললেন, হাজী সাহেব! সম্ভবত এতো মোটাঅংকের হাদিয়া ইতোপূর্বে আপনাকে কেউ দেয়নি! হাজী সাহেব তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, এতো বড় হাদিয়া সম্ভবত আজ পর্যন্ত কেউ ফিরিয়েও দেয়নি! যান, আপনার রুপি নিয়ে আপনি চলে যান। আপনার রুপির আমার কোনও প্রয়োজন নেই। অগত্যা নওয়াজ শরীফ ব্রিফকেস বগলদাবা করে সদলবলে প্রস্থান করলেন।

খোদাভীতি, ইখলাছ ও তাকওয়া-তাহারাতের সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার যাতের উপর তার অগাধ আস্থা ও পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস ছিলো। একাধিকবার এমন ঘটনা ঘটেছে যে, তার ব্যক্তিগত ড্রাইভারেরই অসতর্কতায় কখনো তার গাড়ি দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে, কখনো অন্য গাড়ির সাথে সংঘর্ষ লেগে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু তিনি অন্যান্য মালিকের মতো না-তার ওপর হাত তুলেছেন, আর না-তাকে শাসিয়েছেন; বরং সহানুভূতির সাথে বলেছেন, ভাই! পেরেশান হয়ো না, আমার তাকদীরেই এই মুসীবত লেখা ছিলো, তাই তা আপতিত হয়েছে। তুমি আগামীতেও আমার গাড়ি চালাবে!

এমনিভাবে দাওয়াত-তাবলীগকে কেন্দ্র করে দুনিয়ার কোথাও কোন অস্বাভাবিক বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তিনি মিডিয়া বা খবরের কাগজে তা প্রচার করে বিশ্বজনমতকে নিজের অভিমত জানাতেন না। বরং তৎক্ষণাৎ আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হয়ে কায়মনোবাক্যে নিজের অযোগ্যতা ও অক্ষমতার স্বীকারোক্তি দিয়ে বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও। আমারই দুর্বলতা এবং আমারই অমনোযোগিতার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। হে আল্লাহ! আমারই তরফ

থেকে দীনের মেহনতের প্রতি গাফলতি প্রকাশ পেয়েছে এবং আমিই তোমার বান্দাদেরকে তোমার ও তোমার রাসূলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছি!

পাঠক! আগেই বলেছি, জামা'আত রওয়ানা হওয়ার সময় হেদায়াতী বয়ানে হাজী সাহেব সাথীদেরকে লক্ষ করে বলতেন–যখন তোমরা চার জিনিসকে ক্লান্ত করে দেবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হেদায়াতের সূর্য বানিয়ে দিবেন। ১. বাকশক্তিকে দাওয়াতে ২. পদযুগলকে গাশতে ৩. দেমাগকে ফিকির ও অস্থিরতায় ৪. চক্ষুদ্বয়কে অশ্রু প্রবাহে। আর এটা এমনভাবে করতে হবে যে, যবান কথা বলতে অক্ষম হয়ে যায়, পদযুগল চলতে অস্বীকার করে দেয়, মাথায় ফোঁড়ার যন্ত্রণা অনুভূত হয় এবং চক্ষুদ্বয় কাঁদতে কাঁদতে শুকিয়ে যায়। নিঃসন্দেহে হাজী সাহেব এই চার কাজে নিজেকে ক্লান্ত করে করে যিন্দেগী অতিবাহিত করেছেন। এই অবিরাম মেহনতের ফলে তাঁকে দীর্ঘ একটা সময় শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল। তথাপি তার এই শয্যাশায়ী অস্তিত্বই পাকিস্তানে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে নতুন-পুরাতন সব ফেতনা-ফাসাদ মাথাচাড়া দেয়ার পথে বড় বাধা ছিল।

মৃত্যু অবধারিত। এরই মাধ্যমে মানুষ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে বিদায় জানায়, চিরস্থায়ী ঠিকানায় প্রত্যাবর্তন করে এবং দয়াময়ের দরবারে হাজিরা দেয়। প্রবাদতুল্য ও পরিশ্রমক্লান্ত জীবনের সাড়ে নয়টি দশক অতিবাহিত করে ২০১৮ সালের ১৮ নভেম্বর হাজী সাহেব লাখো কোটি ভক্ত-অনুরাগীদের কাঁদিয়ে চিরস্থায়ী ঠিকানায় রওয়ানা হয়ে গেলেন। রায়বেন্ড ইজতেমার ময়দানে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ লক্ষ মানুষের ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ময়দান ভরপুর হয়ে আশপাশের রাস্তাঘাটেও মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা করে তার জানাযায় শরীক হয়েছে। জানাযায় অধিক লোকের সমাগম কারো কবূলিয়তের দলীল না হলেও আলামত তো নিশ্চয়ই হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা দীনের তরে হাজী সাহেব রহ.-এর অক্লান্ত মেহনতকে ভরপুর কবুল করে নিন। আমাদেরকেও তার পদাঙ্ক অনুসরণের তাওফীক দান করুন। আমীন।

উর্দূ থেকে ভাষান্তর : মাওলানা ইবরাহীম রহমত
শিক্ষার্থী, ইফতা বিভাগ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ শামসুল হক রহ.-এর জীবনের এক ঝলক

গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১৮, মঙ্গলবার দিন শেষে রাত ১২ টার আগে ৯৫ বছর বয়সে দেশের বর্ষীয়ান আলেমে দীন, দেশবিখ্যাত বহু যোগ্য আলেমে দীনের উস্তাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ শামসুল হক ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন চাঁদপুরের ঐতিহ্যবাহী খেড়িহর মাদরাসার দীর্ঘকালীন মুহতামিম। বর্ষীয়ান এই আলেমে দীন মারকাযুদ্দাওয়া আল ইসলামিয়া ঢাকার রঈস মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ও প্রখ্যাত হাদীস শাস্ত্রবিদ, মারকাযুদ্দাওয়া আল ইসলামিয়ার আমীনুত-তা'লীম মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেব-এর পিতা।

মরহুমের নাতি মাওলানা নূরুল্লাহ ও ছোট ছেলে মাওলানা আবদুল আলীমের সংগৃহীত পারিবারিক তথ্য থেকে সহযোগিতা নিয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশের বর্ষীয়ান আলেম মাওলানা শামসুল হক রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৩৩০ বঙ্গাব্দে রোজ শুক্রবার কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ (লাকসাম) থানাধীন শরসপুর গ্রামের দক্ষিণবাড়িতে এক দীনদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়: মাওলানা শামসুল হক রহ.-এর পিতার নাম আব্দুর রহমান ও দাদার নাম উমিদ আলী। পিতা মরহুম আবদুর রহমান একজন পরহেযগার ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বর্ষাকালে নৌকাযোগে লাকসাম থেকে ধান এনে এলাকায় বিক্রি করতেন। হালাল ব্যবসার সামান্য এই আয় দিয়েই তিনি সংসারের ব্যয়ভার নির্বাহ করতেন।

মাওলানা শামসুল হক রহ.-এর মায়ের নাম শামসুন্নাহার। তিনি ছিলেন একজন আবেদা নারী। এই নারীর কোল আলোকিত করে ৯ জন সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

বাল্যশিক্ষা: ৬ ভাই ও ৩ বোনের মাঝে মাওলানা শামসুল হক রহ. ছিলেন ৪র্থ। ছোট বয়সে বড় দুই ভাই মারা যাওয়ায় পিতার ভালোবাসা যেমন সিক্ত করতো তেমনি মায়ের মমতা তাকে আগলে রাখত সবসময়। বাবা-মায়ের কাছ থেকেই তিনি 'বিসমিল্লাহ'র সবক গ্রহণ করেন। এরপর শরসপুর দক্ষিণপাড়ার হুযূর হাফেয সাহেব ও হাসান আহমাদের কাছে এলাকার কাচারীঘরে কায়দা, আমপারা, উর্দু পেহলী ও কারীমা হতে শুরু করে প্রাথমিক পড়াশোনা সমাপ্ত করেন।

পাঠজীবন: মাওলানা শামসুল হক রহ. মাসদারে ফুয়ুয, গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ, মীযান-মুনশাইব, নাহবেমীর ও হেদায়াতুন্নাহব কিতাবাদি পাঠ করেন নোয়াখালীর আমানতপুর মাদরাসায়। আমানতপুর মাদরাসায় তিনি মোট ৪ বছর পড়াশোনা করেন। এরপর চলে আসেন কুমিল্লার বরুড়া মাদরাসায়। বরুড়া মাদরাসায় তিনি মাওলানা ইয়াসীন-এর তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত সুনামের সাথে আবার হেদায়াতুন্নাহব জামা'আতে পড়েন।

শৈশব হতেই লেখাপড়ার প্রতি গভীর মনোযোগ এবং আদব আখলাক ও শান্ত স্বভাবের কারণে তিনি আসাতেযায়ে কেরামের নেকদৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। অন্য ছাত্রদের থেকে তাঁর মেযাজ ও স্বভাব ছিল কিছুটা ভিন্ন। সারা দিন ক্লাস শেষে যখন অন্য ছাত্ররা খেলাধুলায় ব্যস্ত, তিনি তখনও পড়ালেখা ও তাকরার-মুতালাআয় নিমগ্ন থাকতেন।

বরুড়া মাদরাসায় দুই বছর পড়াশোনার পর ময়মনসিংহর তৎকালীন প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান বালিয়া মাদরাসায় চলে আসেন। এখানে তিনি মাওলানা দৌলত আলী ও টাঙ্গাইলের হুযূর-এর তত্ত্বাবধানে জামা'আতে কাফিয়া শেষ করেন। এখানে বছরের মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েন। কাফিয়া জামা'আত শেষ করে আবার পুনরায় কুমিল্লার বরুড়া মাদরাসায় শরহে জামী জামা'আতে ভর্তি হন।

এখানে শরহে জামী ও শরহে বেকায়া জামা'আত শেষ করে চলে আসেন দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায়। এখানে তিনি হেদায়া জামা'আতে ভর্তি হন। হেদায়া আউয়ালাইন, হেদায়া আখেরাইন, জালালাইন, মেশকাত ও দাওরায়ে হাদীস হাটহাজারীতেই শেষ করেন।

মাওলানা শামসুল হক রহ. এখানে মোট পাঁচ বছর পড়াশোনা করেন। হাটহাজারী ছিল তাঁর জন্য একেবারেই নতুন। সবকিছু অচেনা, অজানা, নতুন পরিবেশ। এই নতুন পরিবেশেই নতুন

করে শুরু হয় তাঁর পাঠজীবন। হাটহাজারীতে তিনি মাওলানা নাদেরুজ্জামানের কাছে হেদায়া আউয়ালাইন ও মাওলানা আবুল হুসাইনের কাছে হেদায়া আখেরাইন, সুল্লামুল উলূম কিতাব পড়েন। এছাড়া তৎকালীন হাটহাজারীর নায়েমে তালীমাত মাওলানা আবদুল আযীয রহ. ছিলেন তাঁর তালীমী মুরুব্বী।

হাটহাজারী মাদরাসায় তাঁর দরসের সাথী ছিলেন মাওলানা শামসুল আলম, মাওলানা নূর আহমদ, মাওলানা হাবীবুর রহমান-কচুয়া প্রমুখ।

কর্মজীবন: হাটহাজারী মাদরাসা থেকে পড়ালেখা শেষ করে মাওলানা শামসুল হক রহ. ১৩৮০ হিজরীতে লাকসামের তৎকালীন কাশিপুর মাদরাসায় শিক্ষকতার মধ্যদিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। মাদরাসা থেকে তাঁর জন্য হাদিয়া নির্ধারণ করা হয়েছিল ২৫ টাকা। এখানে তিনি অত্যন্ত সুনামের সাথে লাগাতার ১৪ বছর খেদমত করেন। ১৪ বছর পর তার বেতন ছিল ২০০ টাকা।

এ সময়ে তিনি যে সকল কিতাবের দরসদান করেন তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হল মীযান, ইলমুস সীগাহ, হেদায়াতুন্নাহব, কাফিয়া, শরহে জামী, মুখতাসারুল মা'আনী ও কুতবী। বর্তমান ঢাকার জামি'আ মাদানিয়া বারিধারা মাদরাসার মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী এবং নারায়ণগঞ্জের জামি'আ হোসাইনিয়া হাজীগঞ্জ মাদরাসার সাবেক শাইখুল হাদীস মরহুম মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ রহ. ও কাশিপুর মাদরাসার বর্তমান মুহতামিম মাওলানা উবায়দুল্লাহসহ বর্তমান সময়ের অনেক সুযোগ্য আলেম তাঁর থেকে নাহব ও সরফের ইলম অর্জন করেন।

মাওলানা শামসুল হক রহ.-এর দরদমাখা দরসের সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন জায়গা থেকে তালিবে ইলম আসতে শুরু করে কাশিপুর মাদরাসায়। এদিকে চাঁদপুর জেলার প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান খেড়িহর মাদরাসার মুতাওয়াল্লী জনাব আব্দুল ওয়াদুদ খান আত্মীয়তার সূত্রে কাশিপুর মাদরাসার পার্শ্ববর্তী বেপারী বাড়িতে যাতায়াত করতেন। এই যাতায়াতের সুবাদে তিনি মাওলানা শামসুল হক রহ.-এর দরসের সুনাম ও সুখ্যাতি শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তার ইচ্ছা ছিল কীভাবে তাঁকে তার প্রতিষ্ঠিত খেড়িহর মাদরাসায় উস্তাদ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যায়।

একপর্যায়ে আবদুল ওয়াদুদ খান খেড়িহর মাদরাসার প্রবীণ উস্তাদ ও মাওলানা শামসুল হক রহ.-এর শাগরেদ মাওলানা সাইফুল্লাহর (লৎসরের হুযূর) মাধ্যমে তাঁর কাছে এই মর্মে খবর পাঠান যে, তিনি যদি কাশিপুর থেকে খেড়িহর মাদরাসায় চলে আসেন তাহলে এ এলাকার অনেক ছাত্র তাঁর দ্বারা উপকৃত হবে। পরবর্তীতে মাওলানা শামসুল হক রহ. কাশিপুর থেকে ১৩৯৫ হিজরীতে খেড়িহর মাদরাসায় চলে আসেন।

সে সময় উজানীর ক্বারী ইবরাহীম রহ.-এর খলীফা আল্লামা নূরুজ্জামান রহ. ছিলেন এই মাদরাসার যিম্মাদার এবং খতীবে আযম আল্লামা সিদ্দীক আহমদ রহ. ছিলেন মাদরাসার মুরুব্বী। খেড়িহর মাদরাসায় যোগদানের ২/৩ মাসের মধ্যে মাওলানা শামসুল হক রহ.-কে মুহতামিমের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৩৯৫ হিজরী থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছর তিনি খেড়িহর মাদরাসার মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন।

পরিবার ও সন্তান: মাওলানা শামসুল হক রহ.-এর পারিবারিক জীবন ছিল দীনদারী ও সৌভাগ্যের এক অপূর্ব সমাহার। আবেদা, যাহেদা ও হাফেযা এক সহধর্মিনীর সঙ্গে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। তাঁর ঘর প্রায় সময়ই থাকতো আশপাশের বালিকা ও নারীদের দীন শিক্ষার ঘরোয়া কেন্দ্র। এ ধারাটি এখনো বিদ্যমান। তাঁর ৫ ছেলের সবাই যোগ্য আলেমে দীন। তাঁর একমাত্র কন্যাও দীনী শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত।

তাঁর বড় ও মেঝো ছেলে মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ও মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেবের যোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা ও খ্যাতির কথা দীন ও দীনী ইলমের অঙ্গনের সবাই জানেন। ঢাকা সাহবানিয়া মাদরাসার শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মরহুমের তৃতীয় ছেলে হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মজীদ। চতুর্থ ছেলে হাফেয মাওলানা আবদুল হামীদ উচ্চতর পড়াশোনা করছেন মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে। কেরানীগঞ্জের বৌনাকান্দিতে পঞ্চম ছেলে হাফেয মাওলানা আবদুল আলীম পরিচালনা করছেন শিশু-কিশোরদের একটি মাদরাসা।

আল্লাহ তা'আলা দীনী ইলমের এই মহান খাদেম মাওলানা শামসুল হক রহ.-কে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন। আমীন।

(ইসলাম টাইমস ২৪ ডটকম-এর সৌজন্যে)

এই মাপের আলেম খুঁজে পাওয়া দুষ্কর

উমর ফারুক ইবরাহীমী

উজানী বংশের পুরোধা, চেতনার বাতিঘর, আমাদের বড় আব্বা হযরত ক্বারী ইবরাহীম সাহেব রহ.-কে না-দেখার আক্ষেপে সব সময় পুড়ি। তবুও এই বংশের প্রবীণদের কাছে তাঁর কথা শুনেশুনে কিছুটা হলেও প্রবোধ লাভ করতাম। কিন্তু ধীরে ধীরে এসব প্রবীণদেরকেও আমরা হারিয়ে ফেলছি।

আজ ৮ জানুয়ারী ২০১৯-এ চলে গেলেন আমাদের বড় জ্যাঠা, হযরত ক্বারী ইবরাহীম রহ.-এর দৌহিত্র হযরত মাওলানা শরীফ জালাল সাহেব রহ.। তিনিই ছিলেন বর্তমানে এই বংশের সবচেয়ে প্রবীণ মুরুব্বী। নির্মোহ এই মানুষটি নিজের পুরোটি যিন্দেগী দীনের খেদমতে সঁপে দিয়েছিলেন। সর্বশেষ উজানী মাদরাসার শাইখুল হাদীস হিসেবে আমৃত্যু নিজেকে হাদীসের খিদমতে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

তাঁর ইলমী মাকাম সম্পর্কে লোকমুখে ব্যাপক প্রসিদ্ধ যে, কাঁচপুর থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত এই মাপের আলেম খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

সপ্তাহখানেক আগে অসুস্থ হয়ে রাজারবাগ দি বারাকা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ইন্তেকালের আগের দিন বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। পরের দিন ৮ জানুয়ারি বাড়ি নেয়ার সময় পথিমধ্যে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র ও ১ কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। মাওলায়ে কারীম মরহুমকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন এবং আমাদেরকে সবরে জামীল অবলম্বনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোনে মাসআলা জানতে : ০১৯১৪৬২৭৬১৩ (বাদ আসর থেকে রাত ১০টা)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
স্বপ্নধারা হাউজিং, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

৩০৩ প্রশ্ন : আমি বিয়ে করার পর আমারই একটি রোগের কারণে বাচ্চা নিতে চাইনি এবং আমার স্ত্রীর পূর্বে থেকে দু'টি ছেলে-সন্তান থাকার কারণে সে-ও আগ্রহী ছিলো না। তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে নামায ও অন্যান্য ইবাদত ঠিক রাখা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় হওয়ার পর থেকে আমি কোন কঠিন বা মধ্যম প্রকৃতির কঠিন কাজ করতেও অভ্যস্ত নই। বর্তমানে আমার বয়স ৪৪ বছর। এখন আমি আগে থেকে আরো দুর্বল হয়ে পড়েছি, এজন্য বাচ্চা নেয়ার আগ্রহ আরও কম। ফলে এত দিন আযল করেছি। পরে জানতে পেরেছি, হাদীসে অধিক সন্তান নেয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হয়েছে এবং শরীয়ত স্বীকৃত ওযর ছাড়া কোন ঔষধ বা পরিবার-পরিকল্পনা ব্যবস্থা নেয়া যাবে না। এটা জানার পর থেকে আমি বাচ্চা নিতে আগ্রহী কিন্তু আমার স্ত্রী সম্মত হচ্ছে না। এক বছর আগে থেকে আমার স্ত্রীর মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে। ডাক্তার বলেছে, সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা এই অবস্থায় কম তবে শতভাগ নিশ্চিত নয়; এ অবস্থাতেও কারও কারও সন্তান হয়। আমার জানার বিষয় হলো, আমরা যে এতদিন আযল করেছি, এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী এবং বাকি জীবন আযল করে যেতে পারবো কিনা? যদি আযল করার অনুমতি না থাকে এবং স্ত্রীও সন্তান নেয়ার ব্যাপারে রাজি না হয়, তাহলে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবো কিনা? অথবা এই স্ত্রীকে কিছু জমি অথবা টাকা দিয়ে আমি স্থায়ীভাবে তার থেকে দূরে চলে যেতে পারবো কিনা?

উত্তর : যদি স্ত্রী অথবা শিশু সন্তানের শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে আযল করা সাময়িকভাবে জায়েয আছে। সে আশঙ্কা দূর হয়ে গেলে আযল করা মাকরূহ হয়ে যায়। আর কেউ যদি মাকরূহ কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে বারবার করতে থাকে, তাহলে সে গুনাহগার হবে। প্রশ্নোল্লিখিত অবস্থায় এতদিন কোন গ্রহণযোগ্য ওযর না থাকাতে আযল করার কারণে গুনাহগার হয়েছেন। তাই অতীতের এই কর্মকাণ্ডের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে খালেস দিলে তওবা করলে আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিবেন।

আপনার স্ত্রীকে বোঝাতে থাকুন যে, ইসলামে বিনা ওযরে এই কাজের অনুমতি নেই এবং সন্তান হোক বা না হোক, আমরা এই কাজ আর করতে পারবো না। তাছাড়া যেহেতু মাসিক বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাই আযল করার আর দরকার নেই। এতে সে যদি রাজি না হয়, তাহলে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত হবে না এবং তার থেকে দূরেও অবস্থান করবেন না; বরং যদি সামর্থ্য থাকে এবং সমতা বজায় রাখতে পারেন, তাহলে তাকে স্ত্রী হিসেবে বহাল রেখে আপনি আরেকটি বিবাহ করতে পারেন। (সূরা আন'আম-১৫১, সূরা বনী ইসরাঈল-৩১, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৪৩৮, ১৪৪২, আদ্দুররুল মুখতার ৩/১৭৫, আল-মউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ৩০/৮১, কিতাবুন নাওয়াযিল ৮/৫৪৫, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যা ২৩/২৯৩)

মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম
আমবাগ, গাজীপুর সদর, গাজীপুর

৩০৪ প্রশ্ন : আমি পাঁচ শতাংশ জমিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করি। মসজিদের ডানপাশে একটি পারিবারিক গোরস্থান রয়েছে। ইদানিং মসজিদে স্থান সংকুলান না হওয়ায় তা বর্ধিত করা প্রয়োজন। তাই গোরস্থানে পিলার বসিয়ে মসজিদের দ্বিতীয় তলা বাড়াতে চাই। উক্ত কাজটি শরীয়ত সম্মত কিনা, কুরআন হাদীসের আলোকে জানতে চাই?

উত্তর : নিচে কবর বহাল রেখে উপরে ভবন তৈরি করে ব্যবহার করা জায়েয নেই। নামাযের জন্য ব্যবহার করা তো মোটেও জায়েয হবে না। হ্যাঁ, যতটুকু জায়গায় মসজিদ সম্প্রসারণ করা হবে তাতে যদি কোন নতুন কবর না থাকে, বরং অন্তত দশ বছরের পুরাতন কবর হয়, তাহলে জায়গার মালিকের অনুমতিক্রমে কবরের স্থানকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে নিচ থেকেই মসজিদের জন্য ব্যবহার করা যাবে। এতে মাইয়িতের কোন ক্ষতি হবে না; বরং তার জন্য সৌভাগ্যের কারণ হবে। আর দশ বছরের কম সময়ের কবর নিশ্চিহ্নও করা যাবে না এবং দশ বছরের আগে সেখানে মসজিদ সম্প্রসারণও করা যাবে না। (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক; হা.নং ১৭৭৩২, আল-বাহরুর রায়িক ২/২১০, রদ্দুল মুহতার ২/২৩৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৭, হাশিয়াতুত তাহতাবী; পৃষ্ঠা ৩৫৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২১/৩৬৬)

জামি'আ ইসলামিয়া ইমদাদুল উলূম
কর্তৃপক্ষ, আশুগঞ্জ, বি-বাড়িয়া

৩০৫ প্রশ্ন : আমাদের মাদরাসার আর্থিক লেনদেন দু'টি খাতে হয়ে থাকে। (১) সাধারণ ফান্ড, (২) গোরাবা ফান্ড। গোরাবা ফান্ড থেকে আমরা গরীব ও অসহায় ছাত্রদের বোর্ডিংয়ের খাবার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকি। উক্ত ফান্ড থেকে মেধাবী, ধনী, সাবালক ছাত্রদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আংশিক খোরাকি ও তাদের আংশিক ভর্তি ফি-ও দিয়ে থাকি। এছাড়াও ছাত্রদের জন্য রান্না করা খাবার থেকে উস্তাদগণের খাবার দেয়া হয়ে থাকে।

এখন জানার বিষয় হলো–

(ক) উক্ত ফান্ড থেকে উল্লিখিত খাতসমূহে খরচ করা আমাদের জন্য জায়েয হচ্ছে কিনা? যদি আমাদের উল্লিখিত পদ্ধতিতে কোন সমস্যা থেকে থাকে তাহলে উক্ত খাতসমূহে খরচ করার সঠিক পদ্ধতি কী?

(খ) গোরাবা ফান্ড থেকে বোর্ডিংয়ের বাবুর্চি ও বোর্ডিং ম্যানেজারের বেতন-ভাতা দেয়া জায়েয হবে কিনা?

(গ) উক্ত ফান্ড থেকে আর কোন্ কোন্ খাতে কিভাবে খরচ করা যাবে?

উত্তর : (ক) গোরাবা ফান্ড থেকে গরীব, অসহায় ছাত্রদের জন্য বোর্ডিংয়ের খাবার, প্রাথমিক চিকিৎসা ও আংশিক ভর্তি ফি-এর ব্যবস্থা করা যাবে। তবে ধনী ছাত্রদেরকে এবং ধনী পিতার নাবালেগ সন্তানকে গোরাবা ফান্ড থেকে কোন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেয়া যাবে না। যেহেতু গোরাবা ফান্ডের আয়ের

উৎস হলো যাকাত, ফিতরা, মানত ও কুরবানীর চামড়ার টাকা। আর ধনীদের জন্য এগুলো ভোগ করা জায়েয নয়। তেমনিভাবে গোরাবা ফান্ড থেকে ছাত্রদের জন্য রান্না করা খাবার উস্তাদদেরকে দেয়াও জায়েয হবে না। কেননা উস্তাদগণের খাবার তাদের পারিশ্রমিকের অংশ হয়ে থাকে। এজন্য উস্তাদগণের খাবারের টাকা সাধারণ ফান্ড থেকে বেতনের সাথে দিয়ে দিতে হবে। অতঃপর যে উস্তাদ বোর্ডিং থেকে খাবার গ্রহণ করেন, তার গ্রহণকৃত খাবারের বেলা বা দিন প্রতি যত টাকা 'খাবার বিল' আসে তিনি তা নিজ দায়িত্বে পরিশোধ করবেন, কিংবা কর্তৃপক্ষ তার প্রাপ্য বেতন থেকে খানার টাকা কর্তন করে বোর্ডিংয়ে জমা করে দিবে। খানার টাকা বেতনের সাথে দিয়ে দেয়ার পর যদি কোন উস্তাদ যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত হন তাহলে তাকে গরীব হিসেবে লিল্লাহ ফান্ডের খানা দেয়া যাবে। কেননা তখন তা পারিশ্রমিকের মধ্যে গণ্য হবে না।

(খ) গোরাবা ফান্ড থেকে বোর্ডিংয়ের বাবুর্চি ও ম্যানেজারের বেতন-ভাতা দেয়া জায়েয আছে। কেননা তারা গরীবদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত।

(গ) উক্ত ফান্ড থেকে গরীব ও অসহায় ছাত্রদের সরাসরি যে কোন প্রয়োজনেই খরচ করা যাবে। তবে এমন কোন খাতে খরচ করা যাবে না, যার উপকার ব্যক্তিগতভাবে গরীবরা ভোগ করে না; বরং অন্য কোন মাধ্যম হয়ে তার উপকার গরীব-ধনী সকলেই ভোগ করে। সুতরাং যাকাতের টাকা দিয়ে মাদরাসার কিতাব, ফ্যান ইত্যাদি কেনা যাবে না। (সূরা তাওবা- ৬০, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৫৮২, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ২৭২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৮৭, আদ্দুররুল মুখতার ২/৩৪৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/২৭০)

মাহমুদ
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

৩০৬ প্রশ্ন : (ক) নিজের বৈধ কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে প্রাপ্য টাকা হারাম উৎস থেকে গ্রহণ করা বৈধ আছে কিনা? যেমন, ব্যাংক কর্মকর্তার সন্তানকে পড়িয়ে বেতন নেয়া কিংবা ব্যাংক কর্মকর্তার কাছে কিছু বিক্রয় করে পণ্যের মূল্য নেয়া।

(খ) হারাম উপার্জনকারী ব্যক্তির হজ্জের জন্য পরামর্শ দেয়া হয় যে, সে যেন ঋণ নিয়ে হজ্জ করে। কিন্তু জিজ্ঞাসা হলো, হারাম টাকা থেকে ঋণ পরিশোধ করা হবে– একথা জেনেও ঋণ প্রদান করা কি বৈধ হবে?

উত্তর : (ক) নিজের বৈধ কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে প্রাপ্য টাকা জেনেশুনে হারাম উৎস থেকে গ্রহণ করা বৈধ নয়। অতএব কোন ব্যাংক কর্মকর্তার অধিকাংশ সম্পদ যদি হারাম হয়, তাহলে তার সন্তানকে পড়িয়ে কিংবা জেনে-শুনে তার কাছে কিছু বিক্রয় করে বেতন বা পণ্যের মূল্য গ্রহণ করা জায়েয হবে না। কিন্তু যদি নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, প্রদেয় টাকা সম্পূর্ণ হালাল উপার্জন থেকে দেয়া হয়েছে তাহলে সেটা গ্রহণ করতে কোন সমস্যা নেই।

আর যদি তার অন্য কোন বৈধ আয়ের উৎস থাকে এবং অধিকাংশ সম্পদ জায়েয উপায়ে উপার্জিত হয় তাহলে তার সন্তানকে পড়িয়ে বেতন নেয়া বা তার কাছে কিছু বিক্রয় করে পণ্যের মূল্য বা তার প্রদত্ত উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয আছে। হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে যদি জানা যায় যে, প্রদেয় টাকা হারাম তাহলে সেটা গ্রহণ করা জায়েয হবে না। (আদ্দুররুল মুখতার ৫/৯৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪২, কিতাবুন নাওয়াযিল ১২/৪৯৮)

(খ) কারো কাছে যদি শুধু সন্দেহযুক্ত বা হারাম সম্পদই থাকে এবং এটা তার নিজের উপার্জিত হারাম সম্পদ নয়; বরং অন্যের উপার্জিত হারাম সম্পদ তার কাছে হালাল পন্থায় এসেছে, তাহলে তার জন্য ফুকাহায়ে কেরাম প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে হীলা করার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু এই হীলা অবলম্বন করার দ্বারা তার হজ্জ সহীহ হলেও জেনে-শুনে অপরকে হারাম সম্পদ ব্যবহার করার জন্য দেয়ার কারণে সে অবশ্যই গুনাহগার হবে। অপরদিকে একথা জানা সত্ত্বেও ঋণদাতার জন্য তাকে ঋণ দেয়া জায়েয হবে না। কেননা শুধু হাত পরিবর্তন করার দ্বারাই হারাম সম্পদ হালাল হয়ে যাবে না। বরং সেটা হারামই থেকে যায়। তবে যদি ঋণগ্রহীতা না জানিয়ে হারাম সম্পদ দ্বারা ঋণ পরিশোধ করে তাহলে ঋণদাতার জন্য তা হারাম হবে না। আর যদি হারাম উপার্জনকারী হীলাকারী নিজেই হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে উক্ত হীলা কোনভাবেই প্রযোজ্য নয়। (ফাতাওয়া কাযীখান ১/৩১৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৪৩, আদ্দুররুল মুখতার ৫/৯৮, ৬/৩৮৫, ইমদাদুল হাজ্জ আয ইফাদাতে হাকীমুল উম্মত; পৃষ্ঠা ৮৮-৯০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৮/২৭৯)

মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন
মেট্রো হাউজিং, বসিলা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

৩০৭ প্রশ্ন : সরকারি বিভিন্ন কাজ যেগুলো ঠিকাদারীর মাধ্যমে করানো হয়, সেগুলোতে নির্ধারিত অর্থের বিভিন্ন পার্সেন্ট উদাহরণত ৫% বা ১০% অর্থ সরকারি কর্মকর্তাদেরকে ঘুষ হিসেবে পরিশোধ করতে হয়। আর যদি এমনটি না করা হয় তাহলে তারা কাজের মঞ্জুরিই দিবে না। উক্ত ঘুষ পরিশোধের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি?

উত্তর : ঘুষ নেয়া সর্বাবস্থায় হারাম ও কবীরা গুনাহ। আর সাধারণ অবস্থায় ঘুষ দেয়াও হারাম ও কবীরা গুনাহ। তবে জান, মাল ও ইযযত থেকে জুলুম দূর করার জন্য অপারগতা-বশত ঘুষ দেয়ার অবকাশ আছে। এক্ষেত্রে ঘুষদাতা গুনাহগার হবে না, তবে ঘুষ গ্রহীতা সর্বাবস্থায় গুনাহগার হবে। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৫৮০, রদ্দুল মুহতার ৫/৩৬২, আল-বাহরুর রায়িক ৬/২৮৫, ফাতহুল কাদীর ৮/৪০৮, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৬/২৭৩)

মুহাম্মাদ ইয়াসীন
ঝিগাতলা, ধানমন্ডি, ঢাকা

৩০৮ প্রশ্ন : আমার মামা আমেরিকা থাকেন। কখনও সেখান থেকে আমার কাছে টাকা পাঠানোর প্রয়োজন হয়। অপরদিকে আরেক ব্যক্তি, যার আত্মীয় আমেরিকা থাকেন এবং সেখানে ডলার পাঠানোর প্রয়োজন হয়। তখন আমার মামা উক্ত আমেরিকা প্রবাসী লোকের (যার ডলার প্রয়োজন) কাছে ডলার প্রদান করে। আর আমি বাজারমূল্য অনুপাতে ডলার সমপরিমাণ টাকা উক্ত লোকের (এদেশে বসবাসরত) আত্মীয়ের কাছ থেকে গ্রহণ করে থাকি। এক্ষেত্রে কোন ধরনের ব্যবসার উদ্দেশ্য থাকে না এবং কম-বেশিও করা হয় না; বরং উভয়ের প্রয়োজন মিটানো উদ্দেশ্য থাকে। জানার বিষয় হলো, উক্ত পদ্ধতিতে লেনদেন করা কি হুন্ডির আওতায় পড়বে? শরীয়তের দৃষ্টিতে এর হুকুম কী?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত লেন-দেন পদ্ধতিটি হুন্ডির আওতায় পড়ে। রাষ্ট্রীয় আইনে এর সুযোগ থাকলে শরীয়ত মতে কোন অসুবিধা নেই। (সুনানে ইবনে মাজাহ;

হা.নং ৪০১৬, রদ্দুল মুহতার ৫/১৭৯, ১৮০, ফিকহুল বুয়ূ' লিল-আল্লামা মুহাম্মাদ তাকী আল-উসমানী ২/৭৫৬, ইসলাম আওর জাদীদ মা'আশী মাসাইল ২/৮৬-৮৭)

আল-ইমরান
মানশ্বর রোড, হাজারীবাগ, ঢাকা

৩০৯ প্রশ্ন : (ক) বিশ্ব-ইজতেমা বা বিভিন্ন মাহফিল (যেমন) উপলক্ষে আগত মেহমান ও মুসল্লীদের জন্য কোন কোন কোম্পানী তাদের লোগোসহ শুভেচ্ছাবার্তা, পথনির্দেশক ম্যাপ ইত্যাদি সংবলিত ব্যানার, পোস্টার, ফেস্টুন টানিয়ে দেয়। আবার কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবেও নিজের নাম-পদবীসহ এসব ছাপিয়ে দেয়। এতে কোম্পানীর মালিক বা ঐ ব্যক্তি কি সওয়াবের অধিকারী হবেন, না এটা রিয়া তথা লোকদেখানো কাজ বিবেচিত হবে?

(খ) কোন হিন্দুয়ানী অথবা খ্রিস্টানী অনুষ্ঠানের জন্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা দেয়ার সুযোগ আছে কি? কেউ করলে এতে কি গুনাহ হবে?

উত্তর : (ক) প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে কোন কোম্পানী অথবা ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি শুভেচ্ছাবার্তা বা ম্যাপ প্রদান করে এবং এর দ্বারা কোম্পানী বা ব্যক্তির প্রচার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এতে কোন সওয়াব হবে না; বরং সওয়াবের উদ্দেশ্যে এমনটি করলে তাতে রিয়া হবে; যা সুস্পষ্ট গুনাহ। আর যদি শুধু প্রচারের উদ্দেশ্যে মানুষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয় বা তাদের খিদমত করা হয় তাহলে তা জায়েয হবে, কিন্তু সওয়াব হবে না; কেননা কাজটিতে সওয়াব হাসিলের নিয়তই করা হয়নি। হ্যাঁ, যদি নিজেদের নাম বা লোগো না দিয়ে আগত মেহমানদের জন্য দু'আ করে বা সেবা প্রদান করে, তাহলে তখন কোম্পানী বা ব্যক্তির প্রচার হবে না বটে; কিন্তু সওয়াব হবে।

(খ) বিধর্মীদের জন্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা প্রদান নাজায়েয ও মারাত্মক গুনাহের কাজ। চাই তা কোন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে হোক বা কোন উপলক্ষ ছাড়াই হোক। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/১২, কানযুল উম্মাল ৯/২২, ইমাম ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ কৃত কিতাবুয যুহদ; হা.নং ৩০৩, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তকীন ১০/৭৯-৮২, ৯৯, আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর; পৃষ্ঠা ১০২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/২৭৬)

জুনদুব
মুহাম্মদপুর, ঢাকা

৩১০ প্রশ্ন : (ক) কাব্যে বা কবিতা আকারে কুরআন মাজীদ অনুবাদ করা জায়েয আছে কি? বইয়ের মাঝে মাঝে কিছু আয়াত এনে তার কাব্যানুবাদ করার বিধান কি? যে ব্যক্তি এমনটি করেন তার হুকুম কি? তার পিছনে কি নামায পড়া সহীহ হবে? কুরআনের কাব্যানুবাদ পড়ার বিধান কি?

(খ) কবিতা মিলানোর জন্য আল্লাহ শব্দের শেষের 'হ' ফেলে দিয়ে শুধু 'আল্লা' বলা বা লেখা জায়েয আছে কি? দ্রুত সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : (ক) কুরআন কারীম মুসলিম জাতির উপর আল্লাহ তা'আলার একটি অশেষ নেয়ামত। শরীয়তের দিকনির্দেশনা সমৃদ্ধ কুরআনে কারীম একদিকে যেমন উপদেশ সম্বলিত শাহী কিতাব, অপরদিকে তা মানবজীবনের চির জীবন্ত পাথেয়। কুরআনে কারীমের যথাযথ সম্মান ও ইজ্জত করা প্রত্যেকের উপর অবশ্য কর্তব্য। কুরআনে কারীমের নস তথা মূল আরবী আয়াতের ন্যায় তার অনুবাদ ও তাফসীরকেও অবমূল্যায়ন এবং ভুল বুঝার আশঙ্কা থেকে ঊর্ধ্বে রাখা জরুরী। জেনে কিংবা না জেনে, মূল আয়াতের সাথে কিংবা আয়াত ছাড়া কুরআনে কারীমের কাব্যানুবাদ করা, ছাপানো, প্রচার করা, বিক্রি করা ও পড়া নাজায়েয ও গুনাহের কাজ। অজ্ঞতা বশত কেউ এ কাজ করলে তাকে বারণ করতে হবে। বারণ না মানলে ফাসিক সাব্যস্ত হবে।

কবিতা আকারে কুরআনে কারীমের অনুবাদ করা নাজায়েয হওয়ার যেসব কারণ ফকীহগণ বর্ণনা করেছেন, তার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. অনেক আয়াতে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে যে কোন একটিকে নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে।
২. কবিতার ছন্দ মিলানোর জন্য কোন কোন স্থানে নিজের পক্ষ থেকে কিছু বাড়ানো বা কমানো হয়ে থাকে, যার কোন ইঙ্গিতও আরবীতে নেই। ফলে তরজমায়ে কুরআন নিরাপদ থাকে না।
৩. আয়াতের নিচে নিচে অনুবাদ লেখা হলে, হয়তো কবিতার লাইনের কারণে আয়াতের মাঝে ফাঁক দেয়া হবে কিংবা ফাঁক দেয়া না হলে এক আয়াতের অংশের অনুবাদ অন্য আয়াতের নিচে হবে। উভয় অবস্থায়ই ভুল বুঝার আশঙ্কা রয়েছে।
৪. ছন্দ ও কবিতা আকারে হওয়ার কারণে গজল ও কবিতার মত চিত্তবিনোদনের বস্তুতে পরিণত হবে। ফলে কুরআন ও তরজমায়ে কুরআনের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব হারিয়ে যাবে।
৫. যারা আরবী ভাষা সম্পর্কে অবগত, তাদের তরজমায়ে কুরআন মনে রাখার জন্য কাব্যিক অনুবাদের প্রয়োজন নেই। আর যারা আরবী ভাষায় পারদর্শী নয়, কাব্যিক অনুবাদ তাদের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। আরবী ভাষা না জানার কারণে এক আয়াতের তরজমা অন্য আয়াতে বলার কিংবা কমপক্ষে আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে ভুল বুঝার আশঙ্কা নিশ্চিত থাকে।

শরীয়তের মূলনীতি হলো, কোন জায়েয বা মুস্তাহাব কাজে যদি মাফাসিদ ও গর্হিত বিষয় ঘটার আশঙ্কা থাকে, তবে সে কাজ জায়েয থাকে না; বরং নাজায়েয সাব্যস্ত হয়। পবিত্র কুরআনের ক্ষেত্রে এ নীতি আরো কঠোরভাবে প্রযোজ্য হবে।

তবে যদি কোন ব্যক্তি মাসআলা না জেনে কুরআনের কাব্য-তরজমা করে থাকে এবং মাসআলা জানার পর নিজের ভুল স্বীকার করে তওবা করে নেয়, তাহলে এ ব্যক্তির ইমামতিতে নামায পড়তে অসুবিধা নেই। (সূরা ইয়াসীন-৬৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/২৮৮, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৭/৩১৮, মাজমাউল আনহুর ফী শরহি মুলতাকাল আবহুর ২/৫০৭, আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর; পৃষ্ঠা ১০০, রদ্দুল মুহতার ১/৫৫৯, বাওয়াদিরুন নাওয়াদির ১/৩১৩)

(খ) কবিতা মিলানোর জন্য 'আল্লাহ' শব্দের শেষের 'হ' কে ফেলে দিয়ে শুধু 'আল্লা' লেখা জায়েয নয়। যদি অনিচ্ছায় বা ভুলে 'হ' বাদ পড়ে যায়, তাহলে গুনাহ হবে না মর্মে আশা করা যায়। (হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ১/৯, ২২৩, বাওয়াদিরুন নাওয়াদির ১/২৬২)

মারজান
রওযাতুল উলূম মাদরাসা, বোয়ালমারী, ফরিদপুর

৩১১ প্রশ্ন : সরকারি আলিয়া মাদরাসায় চাকুরিরত জনৈক শিক্ষক অতি অসুস্থতার কারণে ক্লাস নিতে পারছেন না। বিধায়

অন্য একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক উক্ত অসুস্থ শিক্ষকের চাকুরি ঠিক রেখে ক্লাস করিয়ে দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অসুস্থ ব্যক্তির স্থানে ক্লাস নিতে পারবেন কিনা? আর অসুস্থ শিক্ষক বেতন তুলে তা থেকে কিছু অংশ উক্ত অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে (যিনি বর্তমানে ক্লাস নিচ্ছেন) দিতে পারবে কিনা?

উত্তর : অসুস্থ শিক্ষক তার স্থানে যাকে নিযুক্ত করেছেন, মাদরাসা কর্তৃপক্ষ বা পরিচালক যদি নিয়মানুযায়ী তাকে মেনে নেয়, তাহলে উক্ত শিক্ষক তার স্থানে ক্লাস করাতে পারবেন। আর অসুস্থ ব্যক্তির জন্য তার পূর্ণ বেতন উত্তোলন করে কিছু অংশ সাবেক শিক্ষককে (যিনি বর্তমানে ক্লাস নিচ্ছেন) প্রদান করা জায়েয আছে। (সূরা নিসা- ৫৯, রদ্দুল মুহতার ৪/৪১৯, ৪২০, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৫/২৭৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/২৮৫)

মুহাম্মাদ যাকারিয়া মাহমুদ
শিক্ষার্থী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

৩১২ প্রশ্ন : বর্তমানে কিছু লোক একটি গেইম খেলে থাকে, যার নাম ক্লাশ অফ ক্লানস। এই গেইমের টাউনহল-৯ যা কাবা শরীফের সাথে সাদৃশ্য রাখে। আর গেইমের নিয়ম হলো, টাউনহল ভাঙতে হয়। তাই অনেকে বলে টাউনহল ভাঙ্গা আর কাবা শরীফ ভাঙ্গা একই সমান। এখন জানার বিষয় হলো, এই কথার বাস্তবতা কী? এই খেলাটি কি হারামের আওতায় পড়ে? অথবা এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? বিস্তারিত জানালে ভালো হয়।

উত্তর : মোবাইল, ইন্টারনেট ও ইলেক্ট্রনিক্সের সকল খেলাই শরীয়তমতে নাজায়েয খেলার অন্তর্ভুক্ত। এতে অহেতুক সময় নষ্ট করা, জরুরী কাজে উদাসীনতাসহ বহুবিধ খারাবী রয়েছে। আর প্রশ্নে যে গেইমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিশ্চয় মুসলমানদের চরম কোন শত্রু দ্বারা আবিষ্কৃত। এর উদ্দেশ্য কেবল ইসলামের প্রাণকেন্দ্র পবিত্র কা'বা শরীফকে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করা এবং তার অবমাননা করা। সুতরাং শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত খেলা শুধু নাজায়েযই নয়; বরং ঈমানের জন্যও ক্ষতিকারক। নিজ ঈমান ও ইসলামের প্রতি সামান্য মায়াও যার অন্তরে আছে, সে এমন গেইম খেলতে পারে না; আর নিজ সন্তান ও পরিবারের কাউকেও খেলতে দিতে পারে না। (সূরা লুকমান- ৬, তাফসীরে তবারী ১৮/৫৩৭, তাফসীরে মাযহারী ৫/৪৪৯, আহকামুল কুরআন ৩/২০১, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৩১৭, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩৯৫, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৭/৩৩৬, দীনী মাসাইল আওর উনকা হল; পৃষ্ঠা ৩৭১)

আতাউর রহমান
কিশোরগঞ্জ

৩১৩ প্রশ্ন : (ক) আমি তাদারুল হুদা মাদরাসার পরিচালক। কিছুদিন পূর্বে একজন হিতাকাঙ্ক্ষী সরকারি ফান্ড থেকে গরীব ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আমার মাদরাসায় বেশ কিছু কম্বল দেয়। কিন্তু আমার মাদরাসায় গরীব ছাত্র না থাকায় আমি ঐ কম্বলগুলো বিক্রি করে দিই, যার মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা। জনাবের নিকট জানার বিষয় হলো, এ টাকা মাদরাসার জেনারেল ফান্ডে ব্যয় করা যাবে কিনা? ব্যয় করা গেলে তার পদ্ধতি কী? আর ভবিষ্যতে আমি একটি মহিলা মাদরাসা খোলার ইচ্ছা করেছি। এখন খরচ না করে টাকাটা সেই মহিলা মাদরাসায় গরীব ছাত্রীদের জন্য ব্যয় করতে পারব কিনা?

(খ) কেউ বললো, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে সুস্থ করে দেন তাহলে হজ্জ করবো। প্রশ্ন হলো, তার এ কথার দ্বারা কি মানত হয়েছে? মানত হয়ে থাকলে এখন যদি সে হজ্জ করে তাহলে এর দ্বারা কি তার ফরয হজ্জ আদায় হবে, না পরবর্তীতে আরো একবার ফরয হজ্জ করতে হবে?

(গ) জনৈক ব্যক্তি মসজিদের জন্য কিছু টাকা মানত করে এবং আমাকে তা পৌঁছানোর জন্য দেয়। কিন্তু আমার জানা ছিলো যে, মসজিদের জন্য মানত সহীহ হয় না। পরবর্তীতে আমি ঐ টাকা মাদরাসায় দিয়ে দিই। জানার বিষয় হলো, ঐ টাকা তার অনুমতি ছাড়া মাদরাসায় দেয়া কি আমার জন্য ঠিক হয়েছে?

উত্তর : (ক) মাদরাসার গরীব ছাত্রদের জন্য দানকৃত কম্বল বিক্রি করা আপনার জন্য উচিত হয়নি। এখন আপনার কর্তব্য হলো, যে ব্যক্তি ঐ কম্বলগুলো দান করেছেন তার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নিবেন যে, তিনি কোন খাত থেকে কম্বলগুলো দান করেছেন? যদি যাকাতের খাত থেকে দান করে থাকেন, তাহলে তা সরাসরি জেনারেল ফান্ডে দেয়া যাবে না। বরং তাকে সেই মূল্য ফেরত দিয়ে দিবেন। সে নিজেই যাকাতযোগ্য কোন খাতে ব্যয় করবেন বা আপনাকে ব্যয় করতে বললে আপনি যাকাতের খাতে ব্যয় করে দিবেন। আর যদি তা নফল সদকা বা দান হয়ে থাকে, তাহলে তা আপনার মাদরাসার জেনারেল ফান্ডে বা তার অনুমতিক্রমে অন্য কোন মাদরাসায় দেয়া যাবে। (সূরা তাওবা- ৬০, রদ্দুল মুহতার ২/২৫৬, আদ্দুররুল মুখতার ২/৩৪৪, বাদায়িউস সানায়ে' ৬/২১১, আল-বাহরুর রায়িক ৫/২৩৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/৩১৪, ২৩/১৪১, ইমদাদুল মুফতীন ২/১০৮৬)

(খ) যদি মানত করার সময় তার যিম্মায় হজ্জ ফরয থেকে থাকে, আর সে ভিন্নভাবে হজ্জের মানত না করে থাকে, তাহলে তার জন্য শুধু ফরয হজ্জই আদায় করতে হবে। কেননা মানত সহীহ হওয়ার জন্য এটাও শর্ত যে, যে বিষয়ের মানত করা হলো তা ইবাদাতে মাকসূদা তথা মৌলিক ইবাদত যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি হতে হবে এবং তা পূর্ব হতে ওয়াজিব না হতে হবে। আর যদি তার যিম্মায় হজ্জ ফরয না হয়ে থাকে অথবা সে ফরয হজ্জ বাদে ভিন্নভাবে হজ্জের নিয়ত করে থাকে তাহলে তার জন্য মানতের হজ্জ আদায় করা আবশ্যক হবে। ফরয হজ্জ ভিন্নভাবে আদায় করতে হবে বা পরবর্তীতে যদি হজ্জের নেসাবের মালিক হয়, তাহলে পুনরায় তার উপর হজ্জ ফরয হবে, এই হজ্জ যথেষ্ট হবে না; ভিন্নভাবে ফরয হজ্জ করতে হবে। (সূরা হজ্জ- ২৯-৩০, রদ্দুল মুহতার ৩/৭৩৫-৭৩৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/৬৫, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৬/২৯৩, আল-বাহরুর রায়িক ৪/৩২১, দুরারুল হুক্কাম ২/৪৩, উমদাতুর রি'আয়াহ ৫/২৭৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৫/৪৯৪, ইমদাদুল আহকাম ৩/৪৬)

(গ) মসজিদের জন্য টাকা দেয়ার মানত করলে তা মূলত মানত হয় না; বরং নফল দানের নিয়ত হয়। এ নিয়ত যদিও পূর্ণ করার মধ্যেই সতর্কতা রয়েছে এবং নিয়তকারী সেটা মসজিদের জন্যই দিয়েছে। এখন যদি মসজিদের কোন প্রয়োজন থাকে তাহলে মসজিদের জন্যই সে টাকা ব্যয় করতে হবে। আর যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে মাদরাসায় ব্যয় করতে কোন অসুবিধা নেই। (সূরা হজ্জ- ২৯-৩০, আদ্দুররুল মুখতার ৩/৭৩৫, আল-বাহরুর রায়িক ৪/৩২১, বাদায়িউস সানায়ে' ৫/৯৩, ইমদাদুল আহকাম ৩/২৯, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১২/১২৯)

মল্লিক এ জেড হাসান
সভাপতি, পাঁচ-পালড়া জামে মসজিদ, নেত্রকোণা

৩১৪ প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের একটি মসজিদে বর্তমানে দুই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকা জমা আছে। মসজিদের উন্নয়নের কাজ চলছে এবং প্রায় ৭০% কাজ শেষ হয়েছে। মসজিদের জমাকৃত টাকা হতে এখন পর্যন্ত কোন প্রকার টাকা খরচ করিনি। জমাকৃত টাকার উৎস সম্পর্কে আমার মনে প্রশ্নের উদ্ভব ঘটায় এই টাকায় হাত দেয়া হয়নি। বিষয়টি নিম্নরূপ-

প্রথমে মুষ্টির চাউল সংগ্রহ করে টাকা জমা করা শুরু হয়, যা এখনো চালু আছে। কিন্তু টাকার অঙ্ক বাড়ায় এ টাকা দিয়ে জমি বন্ধক রাখা হয়। কারো টাকার প্রয়োজন হলে মসজিদ তহবিল থেকে টাকা নেয় এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলী জমি মসজিদ কমিটির নিকট বন্ধক/গচ্ছিত রাখে। অতঃপর মসজিদ কমিটি উক্ত জমি অন্য কৃষকের নিকট ফসল উৎপাদনের জন্য আধি/বর্গা দেয় অর্থাৎ উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক পায় উৎপাদনকারী কৃষক এবং বাকী অর্ধেক পায় মসজিদ কমিটি। কিন্তু টাকার বিনিময়ে মসজিদে ফসলী জমি বন্ধক/গচ্ছিত দেয়া ব্যক্তি উৎপাদিত ফসলের কিছুই পায় না। তবে ২/১ বছরের মধ্যে বা গ্রহণকারীর ইচ্ছাধীন সময়ে মূল টাকা যথারীতি ফেরত দানপূর্বক তার জমি ফিরিয়ে নেয়। বিষয়টি আমাদের এলাকায় আমজনতার মাঝে স্বীকৃত ও প্রথাগত নিয়ম হিসেবেই সবাই মেনে চলছে এবং এখনো এই নিয়মই প্রচলিত আছে।

মসজিদে জমাকৃত টাকা মসজিদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার না করার আমার ব্যক্তিগত কিছু পর্যবেক্ষণ মহোদয়ের বিবেচনায় সহায়ক হওয়ার উদ্দেশ্যেই পেশ করা হলো।

(১) মসজিদ কোন ব্যক্তিকে টাকা প্রদান করে মাসিক বা বাৎসরিক কোন সুদ ধার্য করলো না বটে তবে তার নিকট হতে প্রদত্ত টাকার অধিক মূল্যের ফসল জমি দখলে নিয়ে নিল, যার উৎপাদিত পণ্য তাকে দেয়া হয় না। যার অংশ পায় কৃষক, যে জমি চাষ করে, বাকী অংশ পায় মসজিদ কমিটি।

অপরদিকে যে ব্যক্তি মসজিদ তহবিল থেকে জমি বন্ধক রেখে টাকা গ্রহণ করল তার পক্ষেও কিছু অতিরিক্ত সুবিধা প্রথাগতভাবেই পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

(১) তাকে কোন সুদী মহাজনের দ্বারস্থ হতে হয় না।
(২) আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, টাকা গ্রহীতার ফসলী জমিতে নানাবিধ কারণে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি বা ক্ষয়ক্ষতি হলে তা টাকা গ্রহীতার উপর কোনভাবেই বর্তায় না, কিন্তু কোন সুদী টাকায় এসব ওযর-আপত্তি কোনক্রমেই বিবেচনায় নেয়া হয় না। তখন ঋণগ্রহীতা নিদারুণ বিপাকে পড়ে যায়।
(৩) তার টাকা পরিশোধের কোন সময়সীমা বা সুদ ধার্য করা হয় না। যখন ইচ্ছা তখনই মূল টাকা জমাপূর্বক বন্ধকী জমি ফেরত নেয়ার পূর্ণ অধিকার থাকে, যা সামাজিকভাবেই স্বীকৃত। তবে ফসলাদি উৎপাদনকালীন সময়ে তা প্রযোজ্য নয়।
(৪) মাসিক/ত্রৈমাসিক কোন কিস্তি প্রদানের বিধান এতে নেই।
(৫) বিশেষ প্রয়োজনে অতিদ্রুত টাকা পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে (যতক্ষণ মসজিদ তহবিলে টাকা থাকে)।
(৬) মসজিদ হতে টাকা গ্রহণ করে কোন টাকা গ্রহীতা যদি কোন লাভজনক কাজে ঐ টাকা ব্যবহার করে কোন প্রকার লাভ উপার্জন করে তাহলে এতে মসজিদ কমিটি কোন দাবী বা আপত্তি করতে পারে না।
(৭) মসজিদ হতে টাকা গ্রহণকারী টাকা পরিশোধে কয়েক বছর অতিবাহিত করলেও অর্থনীতির মুদ্রাস্ফীতির বিষয়টি কারো চিন্তায় আসে না।

এই সমস্ত পর্যবেক্ষণ নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত। গ্রামে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক এ সকল তথ্যাবলি সংগ্রহ করেছি। এ সকল বিধান গ্রামাঞ্চলে লিখিত আকারে নেই বটে, তবে তা সর্বজন স্বীকৃত ও অবশ্য পালনীয় বিষয় হিসেবে প্রচলিত।

এমতাবস্থায় উল্লিখিত মসজিদের তহবিলে দুই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকার সঠিক ব্যবহার নিয়ে আমরা বিপাকে পড়েছি। তাই বিষয়টি কুরআন ও সহীহ হাদীস বা কিয়াসের মাধ্যমে উপযুক্ত সমাধানে আমাদের কৃতার্থ করতে আজ্ঞা হয়, যাতে জমাকৃত দুই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকা ইসলামের বিধান মোতাবেক ব্যয় করা যায়।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণানুযায়ী আপনাদের মসজিদে মুষ্টি চাউল সংগ্রহ করে যে টাকা মসজিদ তহবিলের আয় হয়েছে, তা মসজিদের ওয়াকফ সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। মুতাওয়াল্লির কাছে তা আমানত। মসজিদের প্রয়োজনীয় কাজে তা ব্যয় করা তার দায়িত্ব। জমা টাকা অন্য কোনভাবে ব্যবহার করার অধিকার তার নেই। মসজিদ তহবিলের আর্থিক প্রবৃদ্ধির জন্য এ টাকা ব্যবসায় খাটানোও জায়েয নেই।

বিশেষ করে যখন উক্ত মসজিদের উন্নয়ন তহবিলে দুই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকা মসজিদের প্রয়োজনীয় টাকা; প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়। এতদসত্ত্বেও যদি হালাল কোন পন্থায় বিনিয়োগ করা হতো, তাহলে সে আয় মসজিদে ব্যবহার করা বৈধ হতো। কিন্তু প্রশ্নোক্ত পন্থাটি সম্পূর্ণ সুদী পন্থা।

তাই প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে মসজিদের তহবিলের টাকা বিনিয়োগ করা মোটেও জায়েয হয়নি। এবং এর পরিবর্তে ফসলী জমি বন্ধক রেখে বন্ধকী সম্পত্তি থেকে মুনাফা অর্জন করা সুদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা স্বতন্ত্র আরেকটি নাজায়েয ও হারাম কাজ হয়েছে। কারণ কাউকে ঋণসেবা প্রদান করে তার বন্ধকী সম্পত্তি থেকে লাভবান হওয়া সুদেরই একটি প্রকার। সুতরাং এখন শুধু মূল টাকা মসজিদের কাজে ব্যবহার করা যাবে।

আর মসজিদের তহবিলের টাকা থেকে ঋণ দিয়ে বন্ধকী সম্পত্তিতে ফসল উৎপাদন করে (কৃষকের সাথে আধি চুক্তির মাধ্যমে) যে পরিমাণ টাকা আয় হয়েছে, নাজায়েয উপার্জন হওয়ার কারণে তা হিসেব করে জমিওয়ালা ঋণগ্রহীতাদেরকে ফেরত দিয়ে দিতে হবে। আর এ লেনদেনের সাথে জড়িত উভয় পক্ষকে খাঁটি মনে তওবাও করতে হবে। আর প্রশ্নে আপনি যেসব যুক্তি কল্পনা করেছেন, তা এ লেনদেনের সুদী হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলবে না। (সূরা নিসা- ৫৮, আল-বাহরুর রায়িক ৫/২৫৯, রদ্দুল মুহতার ৫/১৬৬, ১৬৯, ৪১৭, ৬/৩৮৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২২/১৫৪, ১৫৭, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২০৬৯০, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১২৫৪, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৮/৫৬২-৫৬৩, ৫৬৪, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ২/১৬৪, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৭/৪৩১-৪৩২, কিতাবুন নাওয়াযিল ১১/৪৯৮, ১৭/১২৪, তাফসীরে কুরতুবী ৩/৩৬৬)

কিশোর প্রতিভা

আমিও যাব একদিন

বুধবার। জুলাইয়ের শেষভাগ। সকাল থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, তবুও বৃষ্টি থামার লক্ষণ নেই। আগামীকাল সকাল সাতটায় আব্বু-আম্মু আল্লাহর ঘরের যিয়ারতে রওয়ানা হবেন। সন্ধ্যার পর টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পরলাম এয়ারপোর্টের উদ্দেশে; আল্লাহর ঘরের মেহমানদের বিদায় জানাতে। মহাখালীর প্রচণ্ড যানজট কাটিয়ে আমরা একসময় হাজী ক্যাম্পে পৌঁছলাম। বেশিক্ষণ থাকা হল না এখানে। আব্বু-আম্মুকে বিদায় দিয়ে ভারাক্রান্ত মনে বাসায় ফিরলাম। ভাঙা-ভাঙা ঘুমে কেটে গেলো রাতটা। ফজরের সময় আব্বুকে ফোন দিলাম। জানালেন সকাল সাতটা ত্রিশে ফ্লাইট। নাস্তা সেরে ছাদে গেলাম; বিমানটাকে যদি একনজর দেখা যায়! মিনিট দশেক পর বাতাস কেটে কানে আসল বিমানের আওয়াজ। আমার সন্ধানী চোখদুটো খোলা আকাশে ছুটোছুটি শুরু করলো। হঠাৎ পূব আকাশের মেঘ চিরে বেরিয়ে এল বিশাল বিমানটা। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। মনটা আনচান করে উঠলো– কবে যাব আমিও আল্লাহর ঘরে! এবং কবে দেখব নিজের চোখে প্রিয় নবীর প্রিয় শহর!!

আজান্তেই চোখ থেকে গড়িয়ে পড়লো দু-ফোটা তপ্ত অশ্রু। বিমানটা ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র হয়ে একসময় হারিয়ে গেল পশ্চিম দিগন্তে। তখনও আমি নিষ্পলক চেয়ে রইলাম সেদিকে । নিয়ত করলাম, আমিও যাবো একদিন– আল্লাহর ঘরে, রাসূলের দুয়ারে!

সাবিহা সাফফানা
বসিলা

ওরাও মানুষ

চৈত্রের রোদেলা দুপুর। গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত। রোদের তীব্রতায় চাঁদি ফেটে যাওয়ার উপক্রম। ছাতা মাথায় হনহন হেঁটে চলছি। ধানমণ্ডির কোলাহলমুক্ত এলাকা। একের পর এক অতিক্রম করছি বড় বড় অট্টালিকা। চোখ আটকে গেল ফুটপাতে বসে থাকা এক বৃদ্ধের প্রতি। বয়সের ভারে শরীর নুয়ে পড়েছে। পরনে তালিযুক্ত ময়লা কাপড়। ঝুড়িতে লেবু নিয়ে ক্রেতার প্রতীক্ষায় বসে আছে। দেখে বড্ড মায়া লাগলো। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। কত লোক হেঁটে যাচ্ছে, কেউ তার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করছে না। বিত্তশালীদের অহংকার আকাশচুম্বি অট্টালিকার সামনে সে যেন নিতান্তই ফেলনা বস্তু! এদিকে সন্তানের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দিতে ঘামে গোসল করছে এক বৃদ্ধপিতা। ওদিকে এসিরুমে বসে কলম ঠেলে মিনিটে লাখ লাখ হাতিয়ে নিচ্ছে অর্থলিপ্সুর দল। এদিকে খেটে খাওয়া মানুষেরা দুপুরে ডাল-ভাত খেয়ে রাতের খাবার নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভোগে। ওদিকে বিত্তশালীরা পোলাও-কোরমার প্যাকেট নর্দমায় ছোড়ে! এটাই এখন চরম বাস্তবতা। অথচ ধনী-গরীব সবারই প্রথম পরিচয়, তারা মানুষ। দুনিয়াতে এসেছিল সবাই খালি হাতে। আবার খালি হাতেই এখান থেকে বিদায় নেবে। হোক না সে বাইশ তলা অট্টালিকার মালিক কিংবা একজন সামান্য লেবু বিক্রেতা। অবাক লাগে! এই অর্থ-সম্পদ তাদের মাঝে এতোটাই তারতম্য সৃষ্টি করলো যে, ধনীর উচ্ছিষ্ট গরীব খাবে? সে আজ অনেক সম্পদের মালিক বলে অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না, ভিখারি কিবা পথশিশুকে দেখলে দূর দূর করে। কিন্তু কালেরচক্রে তাকেও যে একদিন ভাঙ্গা প্লেট হাতে নিতে হবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে? আসলে মানুষ বোঝে না ভাগ্যের খেলা কতটা নির্মম! ' 'নদীর এপার ভাঙ্গে ওপার গড়ে এই তো নদীর খেলা, সকালবেলার ধনী রে তুই ফকির সন্ধ্যাবেলা'। এসব কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে গেলাম বৃদ্ধের নিকট। আমাকে দেখে তার চেহারায় কিছুটা আশার আলো ফুটে উঠলো। আমার মন চাইল না তাকে নিরাশ করি। সিদ্ধান্ত নিলাম, ঝুড়িতে যত লেবু আছে সব কিনে নেবো। কম কর হলেও ২০/৩০ টা লেবু। তবে এতো লেবু দিয়ে এই একলা আমি কি করবো? যাক সেটা পরে ভাবা যাবে? জিজ্ঞেস করলাম, চাচা! হালি কত করে? বললেন, 'আফনের জন্নি পোনারো টাহা রাকফানে।' বললাম, ঝুড়িতে যতগুলো আছে সব দিয়ে দিন। বেশ আনন্দে লেবুর ব্যাগটা তিনি আমাকে ধরিয়ে দিলেন। ১০৫ টাকা দাম হয়েছে, আমি ২০০ টাকা দিলাম। তিনি আমাকে ১০০ টাকা ফেরত দিয়ে বললেন '৫ টাহা দিয়া লাগবেনানে'। বললাম, এই একশ টাকাও রেখে দিন। আমার পক্ষ থেকে আপনাকে হাদিয়া। বৃদ্ধ আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমি সালাম দিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। প্রধান সড়কে ওঠার আগমুহূর্তে পিছন ফিরে দেখি, তিনি তখনও আমার দিকে কেমন করে তাকিয়ে আছেন!

যুবাইর হাসান
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

মহানুভব শহীদ!

প্রিয় নবীর শহর। মদীনা মুনাওয়ারা। খেলাফতের দায়িত্বে খলীফা উমর রা.। তার শাসনে সবাই সন্তুষ্ট । মুসলিম-অমুসলিম, উঁচু-নিচু সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ মুগ্ধ। তিনি সত্যের পথে অবিচলিত। ন্যায়, ইনসাফ, সততা ও সমতা তার আদালতের সৌন্দর্য। এতে কখনোই তিনি সামান্য বিচলিত হন না। এমনকি অপরাধী নিজের পুত্র হলেও। তবে আজকে অন্য কিছু– মহানুভব খলীফা ও সাধারণ এক গোলামের...

হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা.-এর এক ইরানী গোলাম। আবূ লু'লু। সে-ও মদীনায় থাকতো। মনীব তার উপর মোটা অংকের মাশুল চাপিয়ে দিয়েছেন। আদায় করাটা তার পক্ষে নাকি কঠিন! এ নিয়ে আবূ লু'লু মনীবের প্রতি চরম রুষ্ট! বোঝাটা অবশ্যই হালকা করতে হবে। কিন্তু মনীবকে বলার সাহস তার নেই। তাহলে? খলীফার কাছে গেলে হয়তো সমস্যার সমাধান হবে। তিনি আদেশ করলে মনীব তার মাশুল কমিয়ে দেবেন। ভাবতে ভাবতে আবূ লু'লু একদিন খলীফার দরবারে হাজির।

-হুযূর! আমি আর সইতে পারছি না!

-কী সমস্যা তোমার?

-আমার মনীব আমার উপর সীমাতিরিক্ত মাশুল আরোপ করেছে!
-কতো দিরহাম?
-প্রতিদিন দুই দিরহাম।
-তুমি কী কাজ করো?
-আমি একজন মিস্ত্রী, ভাস্কর।
-নাহ্! তাহলে এটা তোমার জন্য বেশি হতে পারে না। তিনি তোমার উপর বরং দয়া করেছেন। এমন পেশাজীবির জন্য মাত্র দুই দিরহাম মাশুল ধার্য করেছেন। শোনামাত্রই খলীফার প্রতি গোলামের মনে প্রতিশোধ ও হিংসার আগুন জ্বলে উঠল।
-আচ্ছা! বুঝে নিবো।
-একটা গোলাম। সে আমাকে হুমকি দিয়ে গেলো!
খলীফা নবীজীর আদর্শের রঙে রঙিন। তাই তিনি প্রতিবাদ করলেন না। নীরব রইলেন। গোলাম দরবার থেকে বেরিয়ে পড়লো। বাড়ি ফিরল প্রচণ্ড ক্ষোভ নিয়ে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা, যে করেই হোক, এ ফায়সালার প্রতিশোধ গ্রহণ করতেই হবে। তিনি কেন এমন ফায়সালা করতে গেলেন? আমার পক্ষে ফায়সালা দিলেন না! আমার উপর আরোপিত মাশুল তো আমার কাছে বেশিই মনে হয়। কিন্তু এটাকে তিনি সহজ চোখে দেখলেন! এরপর থেকে আবূ লু'লু প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগের অপেক্ষায়। যখন সুযোগ পাওয়া যাবে, তখনই কিছু একটা ঘটে যাবে।
একদিন রাতের শেষ প্রহর। সুবহে সাদিকও মাত্র উদিত হয়েছে। খলীফা উমর রাযি, ছুটেছেন মসজিদ অভিমুখে। আবূ লু'লু অনেক আগ থেকেই মসজিদে। তবে সে নামায পড়তে আসেনি। এসেছে ক্রোধ মিটাতে। খলীফা মসজিদে প্রবেশ করেছেন। আবূ লু'লু বিষাক্ত ছুরি হাতে ওৎ পেতে দাঁড়ানো। ফজরের সুন্নাত পড়া শেষ। খলীফা জামা'আতের ইমাম। নামায শুরু হওয়ার পথে। আবূ লু'লুও প্রস্তুত। যেই উমর রাযি. তাকবীরে তাহরীমা বললেন, অমনি সে খলীফার উপরে আঘাত করে বসলো। যেনো হঠাৎ বিষাক্ত সাপের ছোবল! খলীফা সহ্য করতে পারলেন না। লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। আশপাশের লোকেরা তাকে ধরতে ছুটে এলেন। আবূ লু'লু হিংস্র হয়ে উঠলো। একাই তাদের সকলকে আহত করতে লাগলো। কিন্তু শেষমেষ টিকে থাকতে পারল না। সবাই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এবার বাঁচার কোন উপায় নেই। তাই আবূ লু'লু বেছে নিল আত্মহত্যার পথ। নিজেকে নিজেই হত্যা করলো। নামায শেষ। খলীফাকে তার বাড়ি নিয়ে আসা হলো। এখনো প্রাণবায়ূ উড়ে যায়নি।
-আমার হত্যাকারী কে?
-আবূ লু'লু
-আল্লাহর শোকর! কোন মুসলমানের হাত আমার রক্তে রঞ্জিত হয়নি।

উবায়দুল্লাহ তাসনীম
জামি'আতুল উলূমিল ইসলামিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

সুখের মায়া

চলছে চাঁদের লুকোচুরি খেলা অবুঝ মেঘের সাথে। বাতাসে গাছের পাতাগুলো কাঁপছে তিরতির করে। চাঁদটা কোন দিকে রে? প্রশ্ন করলো আদনান। বললাম, পশ্চিম কোণে সায়ানদের দিঘির পাড়ে। আবার ও বললো, আকাশে কি তারার মেলা বসেছে? বললাম, হ্যাঁ। উত্তর শুনে আদনান একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, আজকে জ্যোৎস্না নামলে তোদের অনেক ভালো হতো তাই না? ও বলছে আর কৃত্রিম হাসছে, কিন্তু ওর অশ্রুসজল চোখ জোড়াতো আমাদের সামনেই। বললাম, এবার থাম না আদনান। আদনান আবার বলতে শুরু করল, পৃথিবীটা অনেক সুন্দর। তার চেয়েও অনেক সুন্দর তোদের সাথে আমার স্মৃতিগুলো। যদিও এখন সেগুলো শুধুই স্মৃতি, আর এক আকাশ হাহাকার! শুধু শুধু আমাকে এখানে এনে তোদের আনন্দগুলো কেন মাটি করছিস? সবাই জড়িয়ে ধরলাম আদনানকে। অজান্তেই আমাদের চোখগুলো ভিজে উঠল।
আদনান আমার ছোটবেলার বন্ধু। দু'বছর ধরে দৃষ্টিহীন। সামান্য জ্বরে চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা কেউ এটা মেনে নিতে পারছিলাম না। অতীতের স্মৃতিগুলো মনে পড়লে আঁখি দুটো ভিজে ওঠে, বেদনায় কাতর হয়ে যাই। সকালে একসাথে মাদরাসায় যাওয়া। বৃষ্টিতে ভিজে ফুটবল খেলা। কদম ফুলের সেই কাড়াকাড়ি এখন স্বপ্ন। কাশফুল মেখে আর বাড়ি ফেরা হয় না বিকেল শেষে। ছুটিতে বাড়িতে গেলে আর নদীতে ঝাঁপ দেয়া হয় না উল্লাস করে। শীতের সকালে ও আর আমায় ডাকে না র‍্যাকেট খেলার জন্য। স্মৃতিগুলো ভুলে যেতে পারলে নিজেকে হালকা মনে হতো। কিন্তু সেটা কি সম্ভব?
আজ চাঁদরাত। কালকে ঈদ। তাই সব বন্ধুরা মিলে আদনানকে রাস্তায় এনেছি ওর মনটা কিছুটা হলেও যেন ভালো হয়। কিন্তু উল্টো আরো খারাপ হলো মনে হচ্ছে। ঈদের দিনটা আমরা কোথাও যাইনি আদনানকে ছেড়ে, যেন ওর কিছুটা হলেও ভালো লাগে। ছুটিতে বাড়িতে এলে সারাদিন ওর পাশেই থাকি। আদনানকে হাসিখুশি রাখতে চেষ্টা করি। কিন্তু ওর পৃথিবীটা অনেক অন্ধকার। সে অন্ধকার দূর করার জন্য যে পরিমাণ আলো দরকার সে পরিমাণ আলো আমার কাছে নেই। তারপরও আলো জ্বালাতাম, হোক না আমার আলো মোমবাতির মত।
ঈদের ঠিক পাঁচদিন পর ফজর নামায পড়ে ঘুমিয়েছি মাত্র। পূবের আকাশে সবে মাত্র রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে। ঘাসের ডগায় শিশিরকণা প্রভাত সূর্যের রাঙা আলোয় ঝলমল করছে। বন্ধুদের চেঁচামেচিতে ঘুম চলে গেল। কিন্তু আলস্যের উষ্ণপরশে চোখ না খুলেই, কী হয়েছে! কী হয়েছে! করছি। পরক্ষণেই কানে ভেসে এলো আদনান শব্দটা। মনটা কেমন করে উঠলো। ধড়মড় করে দরজায় এসে দাঁড়াই। দেখি, সবাই দৌড়াচ্ছে আদনানের বাড়ির দিকে। কিচ্ছু বুঝে আসছে না। আমিও দৌড় দিলাম। সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। বাড়িতে তখনও পৌঁছিনি। সায়ান আমাকে জড়িয়ে ধরলো। জড়তামাখা কণ্ঠে বললাম, কী হয়েছে আদনানের? সায়ান কিছুই বলছে না শুধু কাঁদছে। আরে কি হয়েছে বলবি তো! একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম। সায়ান চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল, আদনান সব দেখতে পাচ্ছে। আল্লাহ ওর চোখ ভালো করে দিয়েছেন। আমিও খুশিতে কেঁদে ফেললাম। খুশিতে বুঝতে পারছিলাম না কী করব? মনে হচ্ছিল খুশিতে জ্ঞান হারাব।

মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

বিবর্ণ কৈশোর

পথের দু'পাশে দিগন্ত বিস্তৃত সরষে-ক্ষেত। মান্ধাতা আমলের একটা ফনিক্স সাইকেল। ছেঁড়া সিটটাকে প্রাণপন আঁকড়ে আছে এক কিশোর। এক পা রডের ফাঁক গলে চলে গেছে রডের অপর পাশে। আরেক পা হাঁটুভাংগা দ-এর আকৃতি নিয়েছে। দুটো পা-ই ব্যস্ত প্যাডেল চাপতে। পায়ের প্রতিটি চাপে প্যাডেল ঘুরছে। দুর্দমনীয় উল্লাসে ডানা মেলতে চাইছে শূন্যে। লক্ষ্যটা আজ দিগন্তে নেমে আসা আকাশ ছোঁয়ার। অন্তহীন পথচলায় অজানাকে জানার। একটুকরো শৈশব। সুখ-সুখ কণ্ঠের বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। অথবা দৃশ্যটা এক খরতাপে দগ্ধ দুপুরের। নদী তীর বেয়ে দিগন্তে চলে যাওয়া পথ। হাটের দিন। ছাতি হাতে খটাখট চলেন গেরস্থ। সাথে সামান-পত্তর বোঝাই বস্তা মাথায় রাখাল। পথের পাশঘেঁষে বয়ে চলা লৌহজং নদী। একদঙ্গল স্কুল-ফেরৎ বিচ্ছু। নদীর সাথে মিতালী তাদের নিত্যদিনের। দাপাদাপি ঝাঁপাঝাঁপি অবিরাম। হঠাৎ শোনা যায় জলদ গম্ভীর হুংকার। পেছন ফিরতেই গলা শুকিয়ে আসে এক কিশোরের। ভয়ার্ত চোখে তাকায় দাদার দিকে। আজ আর রক্ষে নেই। পিটুনি অবধারিত। তারপর সন্ধে হয়। দুরুদুরু বুকে বাড়ি ফিরে অপরাধী কিশোর। একফালি কৈশর। ভয় ভয় অনুভূতির মাঝে সুখের ছোঁয়া। বাবা গল্প করেন। আমি তন্ময় হয়ে শুনি। বিস্মিত হই। শিহরিত হই। কথার বাঁকে আলোড়িত হই। বাবার গলা ঘুমে ভারি হয়ে আসে। নিস্তেজ হতে হতে থেমে যায়। আমি উঠে পড়ি ছাদে। দাঁড়িয়ে চাঁদটার দিকে তাকিয়ে আনমনে খুঁজে ফিরি আমার শৈশব । চোখে ভেসে ওঠে একটা ডাস্টবিন আর ইঁদুরের পচে যাওয়া আধখানা দেহ। কানে বাজে অবিরাম গাড়ির চিৎকার। যন্ত্র- শহরের যান্ত্রিক কৈশোরকে ঝেড়ে ফেলতে চাই মাথা ঝাঁকিয়ে। পারি না। দীর্ঘশ্বাস ভারী হয়ে আসে। চোখের কোণ বেয়ে নেমে আসে একফোঁটা হাহাকার...।

উবাইদুল্লাহ সাকিব
মিনার মসজিদ মাদরাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

হেমন্তকাল

কুয়াশার হালকা চাদর গায়ে দিয়ে আসে হেমন্তকাল। নতুন ধানের মৌ মৌ গন্ধে মুখরিত হয় গ্রামের প্রতিটি জনপদ। শুরু হয় পিঠাপুলির নবান্ন উৎসব। হেমন্তে প্রকৃতির আবহাওয়া থাকে শান্ত ও কোমল। আঁকাবাকা নদী চলতে থাকে নিরন্তর। শূন্য আকাশে ছড়িয়ে থাকে নীল শাড়ি। রাতের জ্যোৎস্নাভরা আকাশে বসে তারার মেলা। দুপুরের নরোম রোদে ঝলমল করতে থাকে ফসলের মাঠ। হেলতে দুলতে থাকে দিগন্তজোড়া সোনালী ধান। সকালে সবুজ ঘাসের ডগায় জমে থাকে শিশির বিন্দু। মনে হয় সবুজ মখমলে ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট মুক্তা। হেমন্তকাল প্রকৃতিতে সৃষ্টি করে এক অনন্য ধারা। আমরা মুগ্ধ হয়ে ভাবি, কতই না সুন্দর আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টি!

মুবারক ইবনে মুনীর
জামি'আ ইসলামিয়া বাইতুল ফালাহ
মুহাম্মদপুর, ঢাকা

কষ্ট হোক, তবুও...

আম্মু-আব্বুর বড় ইচ্ছে ছেলেটা মাদরাসায় পড়ে বড় আলেম হবে। মানুষকে স্রষ্টার প্রতি আহ্বান জানাবে। ছেলেটি যেদিন প্রাইমারী পাশ করল, তার আব্বু তাকে বলল, তোমাকে মাদরাসায় ভর্তি করে দেবো। পিতা সেদিনই ছেলের জন্য পাঞ্জাবী বানাতে দিলেন। নতুন পাঞ্জাবী পেয়ে ছোট্ট ছেলেটির আনন্দ আর ধরে না। তারপর একদিন তার আব্বু তাকে ও তার চাচাতো ভাইকে শহরের এক মাদরাসায় ভর্তি করে দিলেন। যে ছেলেটির অভ্যাস ছিল আব্বু-আম্মুর গলা ধরে ঘুমানো সে ছেলেটি এখন অনেক ছেলের মাঝে ছোট্ট বিছানায় একাকী ঘুমায়। যাকে তার মা খাবার তুলে খাওয়াতেন, সে এখন রোজ রোজ নিজ হাতে খেয়ে নেয়। ছেলেটার চোখে পানি ছলছল করে। অনেক কষ্ট হয় তার মাদরাসায় থাকতে। ছেলেটির চাচাতো ভাই তাকে বলে, ভাইয়া! যত কষ্টই হোক, আমাদেরকে এখানেই থাকতে হবে। ইলমে দীন শিখতে হবে। দেখবে, একসময় এগুলো আর কষ্ট মনে হবে না। বাড়ি থেকে মাদরাসাই আপন মনে হবে। সত্যিই অনেক দ্রুত ওদের আনন্দ ফিরে এলো। মাদরাসাটি নিজের বাড়িতে পরিণত হলো। উস্তাদ-ছাত্র সকলের অনেক প্রিয় হয়ে উঠলো। এক বছর, দু'বছর করে করে আজ ওরা অনেক বড়। পড়া-লেখা প্রায় শেষের দিকে। আব্বু-আম্মু আর উস্তাদগণের দু'আয় ওরা আজ ইসলামের অনেক কিছুই জানে।

প্রিয় পাঠক! তোমাদের কাছে ছেলেটি দু'আ চায়, সে যেন যোগ্য আলেম হতে পারে। ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারে।

হুমায়ুন কবীর
জামি'আ ইসলামিয়া বাইতুল ফালাহ
মুহাম্মদপুর, ঢাকা

দ্বি-মাসিক রাবেতায় লেখা পাঠানোর ঠিকানা

রাবেতা কার্যালয়

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, সাতমসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

ই-মেইল :

rabetaar@gmail.com

মোবাইল

০১৮২৬৬২১৬৬৯

০১৯২৭৩২৪৬৪৭

০১৯১২০৭৪৪৯৫